প্রাঙ্গণ

বিবেকানন্দ কলেজ পত্রিকা

২০০৩

বিবেকানন্দ কলেজ পত্রিকা

২০০৩

ঠাকুরপুকুর, কলকাতা-৭০০ ০৬৩

বিবেকানন্দ কলেজ পত্রিকা

।। পত্রিকা উপসমিতি ।।

শ্রীমতী প্রণতি চক্রবর্তী	ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পত্রিকা
অধ্যাপক প্রণাম ধর	সদস্য
অধ্যাপক নবকিশোর চন্দ	,,
অধ্যাপিকা সুকন্যা সান্যাল	,,
অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী	,,
শ্রীমতী অনামিকা নস্কর	সম্পাদিকা
শ্রী দেবাশিস হালদার	সহ-সম্পাদক
শ্রী সতীশ নস্কর	,,
শ্রী অর্নব ব্যানার্জী	,,
শ্রী মলয় দেব	সদস্য
শ্রীমতী রিমা বোস	,,
শ্রী দেবাশিস পাল	,,
শ্রী ত্রিদীপ ঘোষ	,,

প্রচ্ছদ শিল্পী

পুষ্পেন্দু চ্যাটার্জ্জী

উপদেষ্টা

অধ্যাপক শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য

(প্রাণী বিদ্যা বিভাগ)

বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর ৭০০ ০৬৩ প্রণতি চক্রবর্তী কর্তৃক প্রকাশিত
ও প্রগ্রেসিভ প্রিন্টার্স এন্ড স্টেশনার্স ৬০/৯ এস. এন. রোড কলকাতা ৭০০০৩৮ থেকে মুদ্রিত

বিবেকানন্দ কলেজ পত্রিকা

।। পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ।।

শ্রীনির্মল মুখোপাধ্যায়	-	সভাপতি
ডঃ বিজন মোহান্ত	-	অধ্যক্ষ, সম্পাদক
শ্রীমতী রত্না রায় মজুমদার	-	পৌরমাতা, ১২৮নং ওয়ার্ড
ডঃ শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়		
ডঃ দেবব্রত চৌধুরী		
অধ্যাপক অলোক দাশগুপ্ত		
ডঃ সিদ্ধার্থ গুহ রায়		
অধ্যাপক শম্ভুনাথ নন্দী		
ডঃ জয়ন্তকুমার শীল		
শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী		
শ্রীকেদারনাথ ঘোষ		
শ্রীসুকুমার সরকার	-	পৌরপিতা, ১২৪নং ওয়ার্ড
শ্রীপুলক দাস	-	সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র-সংসদ

সূচিপত্র

কবিতা

কিশোরবেলা, সোনার খাঁচায়	অবশেষ দাস	৭
জীবন	মহাদেব নস্কর	৮
তোমায় আমি ভালবাসি	সতীস নস্কর	৮
রবীন্দ্রনাথের প্রতি	রাজা গুপ্ত	৯
আমাদের অয়নের সমাপ্তি কোথায় ?	দোয়েল নাগ	১০
চেষ্টা	মোনালিসা ব্যানার্জী	১১
মানুষ	পিয়ালী সান্যাল	১১
চিরন্তনী	সুস্মিতা বৈদ্য	১২
বন্ধু	দেবস্মিতা চক্রবর্ত্তী	১২
শীত	নিগম সিকদার	১৩
লেখা	বুদ্ধদেব পন্ডিত	১৩
রক্তদান	সোনালী সুতার	১৪
অন্নাশি	স্বরূপ মেটে	১৪
জীবন	দিগন্ত ব্রহ্ম	১৫
দীন বন্ধু	সুজয় বিশ্বাস	১৫
যুদ্ধ নয় শান্তি চাই	ইন্দ্রনীল নাথ	১৬
The Truth	Munmun Saha	১৭
অভিসার	শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	১৮
মরতে মরতে বাঁচা	শ্রী নবকিশোর চন্দ	২০

গল্প

এক ডালিয়া	স্মৃতি মন্ডল	২১
পুরানো সেই দিনের কথা	স্বাতী চক্রবর্তী	২৪
জঙ্গুলে ভূত	শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য	২৬

প্রবন্ধ

মাণিক বন্দোপাধ্যায় : স্মরণে বরণে	দেবব্রত মুখোপাধ্যায়	২৯
স্বপ্ন	প্রকাশ কুমার জানা	৩১
ভাবীকাল ভয়ঙ্কর হবে	কুন্তল কোটাল	৩২
প্রকৃত বন্ধুত্বের উপলব্ধি	অন্তরা রায়	৩৩
মশক সংবাদ	মানস মন্ডল	৩৪
ছাগলের ধর্মঘট	সত্ত ঘোষ	৩৪
সাম্রাজ্যলোভীদের রক্তচক্ষু	সৈকত ঘোষ	৩৫
অভিজ্ঞতা	অমিত কুমার সাহা	৩৬
কর্ণাটকে ভ্রমণের দিনলিপি	প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য	৩৮
বেলিয়াখালের ডোঙা	দেবারতি বসু	৪১
সুরসিক বিবেকানন্দ	মন্দিরা কর	৪৩
সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী	সিদ্ধার্থ গুহরায়	৪৫
অরক্ষীয়ও কিছুউড়োভাবনা	শুভাশিস ভট্টাচার্য	৪৯
নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী : এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব	শম্পা চৌধুরী	৫১
শ্রীলঙ্কার গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব ও রাজনীতি	সুমিতা চক্রবর্তী	৫৩
সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য সৌন্দর্য ও ভাবঐশ্বর্য্যের একঝলক	দেবযানী হালদার	৫৬
হোমিওপ্যাথি — বিজ্ঞান না অপবিজ্ঞান	ডাঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়	৬০
THE FIRST DAY OF MY COLLEGE	SK SAMIUL HAQUE	৬৪
SEX EDUCATION	Bhaskar Sarkar	65
Financial Frauds and Market Crashes:	Pranam Dhar	66
The Renaissance in Bengal and its European Precedent	Pranati Dutta Gupta	74

VIVEKANANDA COLLEGE
Thakurpukur, Kolkata-700 063
e-mail : info@vivekanamda-college.org
website : www.vivekanamda-college.org

Date : 15.03.2004

From the Desk of the Principal

I am very happy to learn that the next issue of the College Magazine (2002 - 2003) is going to be published very soon under the initiative of the Students' Union which, it is needless to say, is very particular in bringing out the issue every year. The College Magazine is a mirror which reflects the literary and other potentialities of the young learners in the College. I express my thanks to the young talents who have contributed to it and wish them best of success.

The higher education in our country is now passing through a period of great changes. We cannot thrive if we do not prepare ourselves for the phenomenal changes which are taking place in the field of higher education. As one of the premier Colleges of the state of West Bengal, Vivekananda College, as in the past, now also feels the necessity to rise on the occasion and face the challenges. The students in the period of changes have varying demands. Unless the College fulfils the aspirations of the future generation of students, it cannot survive for long.

Flow of grants from the Government for opening diversified courses is gradually being shrunken leaving the college to stand on its own feet and cater to the needs of the students. This is the present day reality. In the changing situation, the only alternative course left, is the self - financing method.

The college has already ventured on running on self-financed subjects. Statistics and Electronics have been introduced from the year 2002-2003 with two other subjects in the emerging areas, viz. Computer Science and Journalism & Mass Communication being added to the option programmes in the current session. These are taught in the general courses. Further it is decided that Honourse Courses in Computer Science and Journalism & Mass Communication would be introduced from the next session for which proposal for extension of affiliation has already been placed to the appropriate authorities.

A Computer Laboratory is installed in the college this year and it will be further improved and expanded to meet the requirements of the Honours students.

Today, modern technology is used for improvement of the teaching - learning process. The Colege has opened up the scope also. A Computer Network Resource Centre has been set up in the College with the financial assistance from UGC. The centre having internet connectivity with ERNET, India provides the facilities to the teachers and stu-

dents to have an access to multimedia material in teaching and learning. Again, the college has also established a linkage with the British Council Library, Kolkata Division, through institutional membership. This access provides the members of all the faculties with the opportunity to borrow books, teaching aids and up-to-date teaching materials.

All these points to a very important fact that it is the journey and not the destination today that we consider most significant.

I am confident that with the whole-hearted cooperation and concerted efforts of all concerned - the Governing Body, the teaching and the non-teaching stuffs, the students and the guardians - Vivekananda College will march ahead maintaining its tradition of being an institute of repute in the State of West Bengal.

In fine I convey my sincere thanks and best wishes to all those who have contributed to the College Magazine and who have laboured so much in the process of bringing out this issue.

Sd/- ***Bijan Mohanta***
Principal-cum-Secretary
Vivekananda College,
Kolkata - 700 063

শিক্ষক সংসদের সম্পাদকের দর্পণে

বিংশ শতাব্দীকে পেছনে ফেলে আমাদের কলেজ পত্রিকা দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে - ছাত্রছাত্রীদের কাঁচা-পাকা কলমের ছোঁয়ায় ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের পরিণত ও সময়োপযোগী লেখার মধ্য দিয়ে।

শুধু পুঁথিগত শিক্ষা নয়, আমরা বিশ্বাস করি সেই শিক্ষায় যে শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ ঘটিয়ে তাদের সুস্থ নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে। এর জন্য দরকার নিজের সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং একে জীবনধারণের এক অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বলে মনে করা।

বাংলা সংস্কৃতির ভাণ্ডার বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ ক্রমশঃ অযত্নের ও অবহেলার শিকার হয়ে পড়ছে। এই সম্পদকে ছাত্রসমাজের কাছে মেলে ধরার প্রবণতা ক্রমশঃ কমে আসছে। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল ইসলাম আজ আর বাঙালীর সাংস্কৃতিক মনের অন্দরমহলে তেমনভাবে জায়গা পাচ্ছেননা।

এ বঙ্গ ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন
তা সবে অবোধ আমি অবহেলা করি
পরধন লোভে মত্ত করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি

কবি মাইকেলের শেষজীবনের এই অনুতাপ থেকে শিক্ষা নেবার সময় এসেছে। বাংলা সংস্কৃতির আজকের এই দীনতা দূর করার জন্য ছাত্র, শিক্ষক ও সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের পরিচয়, আমাদের সংস্কৃতি এই পরিচয়কে ধরে রাখার জন্য এর সুস্থ বিকাশ অপরিহার্য।

কলেজ পত্রিকার সুষ্ঠু প্রকাশ এই বিকাশের পথে একটা ছোট পদক্ষেপ। এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করছি।

শুভেচ্ছান্তে
অলোক দাশগুপ্ত
সম্পাদক
বিবেকানন্দ কলেজ

সাধারণ সম্পাদকের কলম ২০০২-২০০৩

বিবেকানন্দ কলেজ

আমরা প্রথমেই অভিনন্দন জানাই বিবেকানন্দ কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে যারা আমাদের উপযুক্ত মনে করেছেন ও নির্বাচিত করেছেন ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধি হিসাবে। আমি নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের মুখপাত্র হিসাবে এই লেখা শুরু করছি। আমরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্রসংসদের দায়িত্বে এসেছিলাম কিছু বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে, আজ আমরা আনন্দের সঙ্গে দাবী করতে পারি যে আমরা সেই প্রতিশ্রুতি অনেকটাই রক্ষা করতে পেরেছি। শুধু বিবেকানন্দ কলেজ ঘিরে নয়, বর্তমান সমাজে ছাত্র হিসাবে আমাদের দায়বদ্ধতা এবং সামাজিক দায়িত্ব এই ছাত্রসংসদ তাদের সাধ্যমত পালন করতে চেষ্টা করেছে। আমেরিকা যখন নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করতে গিয়ে ইরাকের সাধারণ মানুষের ওপর বোমা নিক্ষেপ করেছিল, যখন দুর্বিষহ করে তুলেছিল গোটা বিশ্বের শান্তিরপরিবেশ আমরা তখন বিভিন্ন সেমিনার ও মিছিলের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানিয়েছি এবং চেষ্টা করেছি ইরাকের সেই বিপন্ন মানুষগুলির পাশে দাঁড়াবার। আমরা সমাজের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের রুগীদের জন্য আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করেছি। আমরা দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রীদের জন্য এবছর বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছি। আমরা প্রত্যেক বছর রক্তদান শিবিরের আয়োজন করি। আমরা স্বাধীনতা দিবসে কলেজ সংলগ্ন বিভিন্ন অঞ্চলে বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করি। আমরা বিভিন্ন প্রাথমিক স্কুলের গরীব ছাত্রছাত্রীদের কাছে শিক্ষার সরঞ্জাম সরবরাহ করেছি। বিগত দিনে মালদহের বন্যা পীড়িত মানুষের কাছে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছি। নির্বাচনকালে ছাত্র-সংসদের মূল প্রতিশ্রুতি ছিল স্বচ্ছ ও দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন এবং শিক্ষার স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তোলা। কলেজের শিক্ষার উন্নতি,খেলাধূলার ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিষয়গুলিতেও আমরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করি। যেমন কলকাতার কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অ্যাডমিশনের সময় স্বজনপোষন ও দুর্নীতির আখড়া হয়ে ওঠে, আমরা সগৌরবে দাবী করতে পারি ছাত্রছাত্রীর চাপ থাকা সত্ত্বেও মেধার ভিত্তিতে ভর্ত্তির প্রক্রিয়া বরণ করা হয়, দুস্থ ছাত্রছাত্রীদের জন্য ছাড়ের ব্যবস্থা করা হয়, বই কেনার জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়, এছাড়াও ছাত্রসংসদের উদ্যোগে ও অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের সহযোগিতায় একটি Book Bank খুলতে সমর্থ হয়েছি এবং বাহিরের থেকে কম দামে ছাত্রছাত্রীদের কাছে পড়াশোনার সরঞ্জাম পৌঁছে দেবার জন্য একটি Cheap Store খুলতে পেরেছি। আমরা দীর্ঘদিনের আন্দোলনের দ্বারা এবছর কলেজ প্রাঙ্গণে বিবেকানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি। আমরা প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে একটা স্বাভবিক পরিবেশ দিতে পেরেছি যে পরিবেশে তারা নির্দ্বিধায় খোলা আকাশের নিচে ঘুরতে পারে। আমরা কলেজের সৌন্দর্য্য বজায় রাখার জন্য প্রতিনিয়ত লড়ছি, উদাহরণ স্বরূপ ক্যান্টিনের সংস্কার করেছি। জঞ্জাল-জঙ্গল কেটে বাগান করেছি ও একটি ডোবার জায়গা সংস্কার করে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে লড়াই করেছি। আমাদের সতর্ক দৃষ্টি থাকে ক্যান্টিনের খাবারের মান ও মূল্যের ওপর এবং পানীয় জলের ওপর। আমরা আন্দোলনের মাধ্যমে লাইব্রেরীর সংস্কার করতে পেরেছি, বাণিজ্য বিভাগের নতুন সিলেবাসের বই ও অন্যান্য বিভাগের প্রয়োজনীয় বই-এর অধিক সরবরাহের জন্য প্রতিনিয়ত লড়ছি। আমরা ল্যাবটরীর আমূল পরিবর্তন করেছি। আমরা আগামী দিনে যে কর্মসূচী গ্রহণ করতে চলেছি তা হলো - ছাত্র কমনরুমে আয়তন বাড়ানো, সেখানে আরো খেলার সরঞ্জাম বৃদ্ধি, কলা ও বাণিজ্য বিভাগের বিল্ডিংএ জলের কলের ব্যবস্থা,

বড় শ্রেণীকক্ষে এন্ (N)-7 মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা, University ও C.A.B. Tournament-এ কলেজের টিমকে আরো শক্তিশালী করা, আন্ত ক্লাস আবৃত্তি ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি।

এছাড়া আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও অন্যান্য কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকি যেমন - নবীন বরণ, সরস্বতী পূজা, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষক দিবস, University C.A.B. Cricket Football প্রতিযোগিতা। দেওয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে আমরা ছাত্রছাত্রীদের সৃষ্টিশীল কাজে উৎসাহদানের চেষ্টা করি। আন্ত ক্লাস ক্রিকেট, টেবিল টেনিস, ফুটবল, ক্যারাম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের খেলার প্রতিভা তুলে ধরার চেষ্টা করি। এই সমস্ত অনুষ্ঠানে শুধু ছাত্র ছাত্রীরা নয় সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষাকর্মীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

পরিশেষে মনে করিয়ে দিতে চাই, একজন মুখপাত্র হিসাবে আমি এমন এক বিবেকানন্দ কলেজের স্বপ্ন দেখি যা গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় আগামী দিনে অন্যতম ও সেরা হবে এবং সকল ছাত্রছাত্রীর কাছে আবেদন জানাই এই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার।।

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ,

পুলক দাস

সাধারণ সম্পাদক

বিবেকানন্দ কলেজ ছাত্র সংসদ

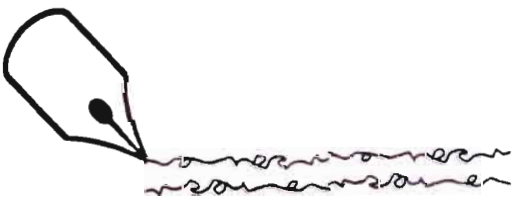

পত্রিকা সম্পাদকের দর্পণে

গতবছরের মতো এই বছরও আমরা ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে আমাদের কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করলাম।

কলেজের নানা কর্মসূচীর মধ্যে কলেজ পত্রিকা প্রকাশ করাটাও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নবীন বরণ, বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন দরকার ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ হলো ম্যাগাজিন প্রকাশ করা, কারণ এই কলেজ ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই ভবিষ্যতের অনেক প্রতিভা উঠে আসে। অনেক ছাত্রছাত্রীরা কলেজ ম্যাগাজিনকে লেখনীর প্রথম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আমরা অশা রাখছি যে আমাদের কলেজ পত্রিকার মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন প্রতিভা উঠে আসবে এবং আমাদের কলেজের নাম উজ্জ্বল করবে।

বর্তমানে বিজ্ঞান আমাদের পথ চলাকে অনেক সহজ করে তুলেছে কিন্তু এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ, ধর্মান্ধতা, ধর্মযুদ্ধ বন্ধ করা যায়নি। এইসব কাণ্ডকারখানা আমাদের সমাজকে কলুষিত করেছে, এর মাধ্যমে চলছে "জাতের নামে বজ্জাতি"। এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমরা দেখেছি রাজনৈতিক সুবিধাবাদীরা গুজরাটে দাঙ্গা লাগিয়েছে। ইরাকের উপর আমেরিকার নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড তাও আমাদের দেখতে হয়েছে এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে। আমরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাচ্ছি, চাইছি এই অবস্থার পরিবর্তন। আমরা চাই মানুষ এই ভেদাভেদ ভুলে সবাই মিলেমিশে এক হয়ে যাক। আমরা দেখতে চাই নতুন দিনের আলো। কিন্তু এই নতুন দিনের আলো দেখতে হলে ছাত্রসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে আন্দোলন করতে হবে এই নিষ্ঠুর কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আমাদের কলেজ পত্রিকাকে আন্দোলনের প্রাথমিক হাতিয়ার করে তুলতে হবে।

এইবছর আমাদের কলেজের চুয়ান্ন বছর পূর্ণ হলো। এইবছর কলেজ পত্রিকায় তোমরা একটা নতুনত্ব লক্ষ্য করবে, সেটা হলো আমরা কলেজপত্রিকার নামকরণ করেছি। "প্রাঙ্গণ"। আমাদের কলেজপত্রিকার নতুন নাম। দেওয়াল পত্রিকার মতো কলেজ পত্রিকারও নামকরণ করা হলো। শুধু এই নয় তোমরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করলে আমরা তোমাদের আরো অনেক নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারবো। এই আশা রাখছি।

এইবারও অনেক ছাত্রছাত্রীর লেখা ছাপা গেলনা, তাই তাদের বলছি মনখারাপ করো না, তোমরা ভেবনা যে তোমাদের লেখা অযোগ্য। আসলে আমাদের ইচ্ছা থাকলেও সীমিত সাধ্যের জন্য সবার লেখা ছাপানো সম্ভব হয়নি। আগামীবার নিশ্চয় ছাপানো হবে। আমাদের আশা আগামী বছর তোমরা আমাদের কলেজপত্রিকাকে সমৃদ্ধ করার জন্য আবার এগিয়ে আসবে। শুধু কলেজ পত্রিকা নয় দেওয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেও আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে।

অবশেষে কলেজের সব অধ্যাপক - অধ্যাপিকা, শিক্ষাকর্মী, ছাত্রছাত্রী এবং যাঁরা আমাদের পত্রিকা প্রকাশের জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার লেখা শেষ করছি।

সংগ্রামী অভিনন্দনসহ,

অনামিকা নস্কর,

পত্রিকা সম্পাদক, বিবেকানন্দ কলেজ ছাত্র সংসদ,

২০০৩ - ২০০৪

কিশোরবেলা, সোনার খাঁচায়

অবশেষ দাস
তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা

অনেকটা পথ পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কিশোরবেলা
ধোঁয়া-ধূসরিত স্বপ্নের ঘরে করছে নীরবে খেলা।

সে খেলার রঙ নিকানো উঠান, শিশিরভেজা ঘাসে
ঢাকা পড়ে গেছে পথের ধুলোয়, সবুজের চারপাশে।

পাঠশালা ছিল পথের বাঁকেতে, ছোট এক চালাঘর
তখন ছিল না হিংসা-বিভেদ, কে-কার আপন-পর।

ঘরের অদূরে বাঁশের সাঁকো, সাঁকো পেরোলেই মাঠ
মাঠের ওপারে আমের বাগান, ডুব সাঁতারের ঘাট।

জল টলমল কলমীলতা, ঝিক্‌মিক্ করে রোদ
তখন ছিল না চলার পথে, কান্ড-বিবেক বোধ।

তখন ছিল রাখাল বালক, গাজনতলার মেলা
শিউলি ফুলের নরম কুঁড়ি, কাগজ গড়া ভেলা।

বন্ধু ছিল নবীন-মাধব, যাদব-সুবোধ-রতন
বন্ধু ছিল গাছ-গাছালি, সবার মনের মতন।

খেলতে খেলতে পড়ত বেলা, ফুটত সাঁঝের তারা
তুলসী তলায় জ্বলত প্রদীপ, পেতাম ঝিঁঝির সাড়া।

ঘরের দাওয়ায় দোলনা ছিল, জান্‌লা ছিল ভাঙা
খেলত ঘরে চাঁদের আলো, ডাকত ভুবন ডাঙা।

ডাকত আমায় শ্রাবণধারা, পৌষমেলার গান
বাবুই পাখির ছোট্ট বাসা, পানকৌড়ির স্নান।

পড়াশুনায় মন ছিল না, এ মন ছিল শঙ্খচিল
ফিরবে না আর একটুও হায়! সে সবদিনের অঙ্কমিল।

মা বলত, 'ধন্যি ছেলে, দত্যি তুই এক রত্যি'
সুখের সেদিন অনেক দূরে — হারিয়ে গেছে সত্যি!

রঙ-তুলিতে কিশোর রঙে, সুখের সেদিন আঁকি
কিশোরবেলা সোনার খাঁচায় — স্পর্শ পেতে ডাকি।

জীবন

মহাদেব নস্কর
১ম বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা

জীবন মানেই সৃষ্টি হওয়া
নতুন কিছু পাওয়া।
জীবন মানেই বেশি চাওয়া
অল্প কিছু পাওয়া।
জীবন মানেই স্বপ্ন দেখা
স্বপ্ন ভেঙে যাওয়া।
জীবন মানেই লড়াই করা
হারতে না চাওয়া।
জীবন মানেই হেরে যাওয়া
হারতে হারতে পাওয়া।
জীবন মানেই ধ্বংস করা
জীবন মানেই গড়া।।

তোমায় আমি ভালবাসি

সতীশ নস্কর
১ম বর্ষ,সাম্মানিক ইতিহাস

বলিনি ঠিক এই কথাটি আমায় তুমি ভালবাস
আমায় দেখে হে সুন্দরী মুখটি টিপে কেন হাস
ব্যথার ভার বইতে নারি ঝরেগো জল আমার চোখে
হয়গো তোমার মলিন বদন, বল তখন কোন সে দুখে?
কান্না আমার জীবন সাথী সারা জীবন কাঁদি আমি
ভাল যদি নাই বাসিলে কেন ব্যথা পাওগো তুমি?
চাতক পাখি সারা জীবন মেঘের কাছে যাচে বারি,
পিপাসাতে মরলে তবু পান করে না অন্য বারি
আঁধার রাতি কষ্টদায়ক তাইতো চাঁদকে করি আশা
একক জীবন রাত্রি সম তাই প্রয়োজন ভালবাসা,
সত্যি তুমি একটুখানি নাই বা এলে আমার পাশে
স্বপ্নে তুমি দিব্বি আছ আমার বুকে হেসে হেসে,
হয়ত আমার স্বপ্নগুলি সত্যি হবে নাকো কভু
দিবা-নিশি আমার হৃদয় এমন স্বপ্ন চায়গো তবু।
তোমায় নিয়ে স্বপ্ন যত দেখছি আজি হৃদয় জুড়ে
হয়তো বা সে ভেঙে যাবে অজানা এক কোন সে ঝড়ে।
ভেঙে দেবে এ বুক আমার কেড়ে নেবে ভালবাসা
শূন্য হবে আমার ভুবন চূর্ণ হবে সকল আশা।
তাইতো তোমার অশ্রু নিয়ে একটি কথা লিখে গেলাম,
নিজের করে তোমায় আমি চিরতরে নাই বা পেলাম।
মরণপারে তোমার তরে দুয়ার খুলে থাকব বসে
সে দিন ভুলে যেও নাগো, হেসে হেসে এসো পাশে।
সে দিন তোমার হাতটি ধরে বলব আমার যত কথা
তোমায় পেয়ে ভুলব আমি অতীতের সকল ব্যথা
গোলাপ, চাঁপা ফুটবে সেদিন বাজবে মোদের মিলন-বাঁশি
কানে কানে সে দিন বোলো "তোমায় আমি ভালবাসি।"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি

রাজা গুপ্ত
দ্বিতীয় বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা

রৌদ্রময় জীবনের কৈশোর থেকে
এখনও তোমার কাব্যময়, কবিতাময়
অক্ষয়, অমর, দ্যুতিময় স্মৃতি
মনের জনপথে, প্রেরণা আনে এগিয়ে চলার
বিশ্বাসে আনে সবুজপাতার সজীবতা।

জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংসতার পদধ্বনি
সাহেবী খেতাব ফেরানোর দৃঢ় প্রত্যয়,
সূর্যঝলসিত হাত রচনা করে - প্রেরণা কবিতার।
এখনও উচ্চতর কোন মিনার নিশ্চয়ই নেই
এই পৃথিবীতে - যা তোমার সৃষ্টির আকাশকে
লঙ্ঘন করতে পারে অনায়াসে।

তোমার গানের মিছিলের সামনে বাঙময়,
হৃদয়ের তৃণক্ষেত্র - নতুন শস্যের সম্ভাবনা,
জীবনের শত শত বিশীর্ণ কঙ্কাল কান্না,
ঘাম, রক্ত – তোমার অনুভবে বুকের কিশলয়
মানবতার ইস্তাহার - বাস্তবকে দেয় গভীর চুম্বন।

শান্তির শান্তিনিকেতনে এখনও ভাস্বর
তোমার সেই চিরনবীন সনাতন ছবি,
কি ভাবে কি করে চক্রাকারে আবর্তিত হয়
আলোর সমুদ্রে - উদ্ভাসিত স্বাদেশিকতা
সোনালী রৌদ্র, প্রাণে আনে অলৌকিক প্রভাত।

আমার স্বদেশের বুকে কুৎসার হিংস্রতা
বিষাক্ত বারুদের গন্ধে, নেকড়ের ধূর্ততা -
অন্তরাত্মার সকরুণ আত্মসমর্পনের ছবি
সকলে সহ্য করে অত্যাচারের অমাবস্যা বলে,
তবুও আমার মনের দৃঢ় প্রত্যয় —
তোমার সৃষ্টি – নিরস্ত্র হাতেই সাহস আনে
যৌবনের শিরা - ধমনীতে উদ্দাম প্রাণচঞ্চলতা
অসত্যের ওপর হাতুড়ি আঘাত হানে
বাঁচার শপথে .....তোমার অপূর্ব সৃষ্টি
উচ্চারিত হয় কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে।

আমাদের অয়নের সমাপ্তি কোথায় ?

দোয়েল নাগ
১ম বর্ষ, সাম্মানিক ইংরাজী

আমরা পথিক,
আমরা - আমরা ক'জন
পথ হাঁটছি সহস্র বছর ধরে।
দোসর বিহীন কী সত্যি আমরা, নাকি দোসরের
সন্ধানেই আমরা হেরেছি জীবন-যুদ্ধে —
আমাদের চলার পথে অনেকে আমাদের সাথে
পদধ্বনি মেলাতে চেয়েছিল।
পারেনি তারা। তাদের হীনমন্যতা , দুর্বলতা বিচ্যুত
করেছে তাদের পথ থেকে। এখনও হেঁটে চলেছি
আমরা ক'জন। যাত্রার প্রারম্ভে আমরা ছিলাম নবীন
প্রাণবন্ত, উচ্ছল। সময়ের স্রোতে এখন আমরা
পরিণত শান্ত — বার্ধক্য রাজত্ব করে আজ
আমাদের অস্তিত্বের উপর।
জীর্ণ দশা, একরাশ উস্কো-খুস্কো পাকা চুলের বোঝা।
শীর্ণ শরীর, মেরুদন্ড আজ দিনরাত্রির
সোলতে।
তবু হাঁটছি আমরা – হেঁটে চলেছি। মাথার উপর
নক্ষত্র - খচিত আকাশের ছাউনি –
পায়ের তলায় নিষ্পাপ দীনতা, রক্তে-সিক্ত মাটির
মেঝে –
পেটে ক্ষুধার জ্বালা, গলায় তৃষ্ণার অতৃপ্ততা —
পরনে জীর্ন এক টুকরো কাপড় – তবুও হেঁটে
চলেছি আমরা বাঁচার তাগিদে।
বাঁচবো! বাঁচবো! আমরা একদিন সত্যিকারের
ভালোভাবে বাঁচবো।
তবুও হেঁটে চলেছি আমরা সেই বাঁচার দিনের খোঁজে।
কোথায় আমাদের গন্তব্য কোথায় এই অয়নের সমাপ্তি।
সেই বাঁচার দিন কী শত আলোকবর্ষ দূরে .....

চেষ্টা

মোনালিসা ব্যানার্জী
১ম বর্ষ , সাম্মানিক বাণিজ্য

কবিতা লিখতে জানিনা আমি,
তবুও করি চেষ্টা,
মনের কথা খাতায় লিখে
মেটাই মনের তেষ্টা।

শিক্ষা আমার খুব সীমিত,
ভান্ডারে নেই জ্ঞান,
তাই অনুরোধ পাঠকের কাছে,
বাঁচিও আমার মান।

সমাজে অনেক বড় বড় কবি
মাথা তুলে আজ দাঁড়িয়ে,
তাঁরা যেন আজ কাছে এসে মোরে,
দেয় দুই হাত বাড়ায়ে।

অমি একজন ক্ষুদ্র কবি,
পরিচিতি মোর নাই,
তবুও তোমরা ভালবেসে মোরে
কাছে ডেকে নিও ভাই।

ঋণী চিরকাল থাকব আমি
তোমাদের কাছেতে,
আমার কবিতা থাকবে বেঁচে
তোমাদের মাঝেতে।

মানুষ

পিয়ালী সান্যাল
১ম বর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

অসল মানুষ সেই হবে,
যার মান আর হুঁশ রবে,
সমাজের বুকে বেঁচে থেকে যারা
সমাজের সাথী হবে।

ধনী - দরিদ্র সকলের, যারা
বুঝবে মনের ব্যথা
রাস্তায় থাকা মানুষের, যারা
শুনবে মনের কথা।

প্রকৃত মানুষ তারাই হবে,
এই সমাজের বুকে –
বিলাসের মাঝে থেকেও যারা
কাটাবেনা দিন সুখে।

চিরন্তনী

সুস্মিতা বৈদ্য
দ্বাদশ শ্রেণী, কলাবিভাগ

রক্ত - রঙিন পূব দিগন্তে সূর্য উঠছে – উঠবেই ;
মুক্ত বিহগ জাগরনী গান গেয়ে ছুটছে – ছুটবেই।
স্কন্ধে লাঙল কিষানের দল প্রান্তর পানে চলেছেই।
ঝর-ঝর-ঝর শ্রাবণের ধারা অঝোরে ঝরছে – ঝরবেই,
বরষণ - ঘন আঁধার রাতের চমকিত সে যে কর'বেই!
ঝড়ের আঘাতে সাগরের বুক তাণ্ডবে মাতে – মাতবেই;
তোলপাড় যেন বসুধা ভূধর মহীরে সে আজ গ্রাসবেই।
কাণ্ডারী তবু তরী লয়ে সেথা ছোটাছুটি খেলা খেলবেই,
রুদ্ধ কারার বন্ধ নাশিয়া বিপ্লব – সে তো বাঁচবেই।
নরমেধ-বান-অনল শিখায় আঁধারের বাঁধ ঘুচবেই।
তিমিরের শেষে নতুন প্রভাত নবারুণোদয়ে হাসবেই;
নতুন যুগের সবুজ সাথীরা ঘুমঘোর ভেঙে জাগবেই,
অত্যাচারীর শোষণের জাল ছিঁড়বে – ওরা ছিঁড়বেই।

বন্ধু

দেবস্মিতা চক্রবর্ত্তী
১ম বর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

আকাশ ভরা গুচ্ছ তারার মাঝে
একটা তারা একটু দূরে আছে
নীল আকাশে তারা দেখতে দেখতে
ইচ্ছা হল বন্ধু করি ওকে
শিশির কালি ঘাস কলমে ভরে
ইচ্ছা চিঠি লিখে
পাঠিয়ে দিলাম মেঘের দেশে
মেঘ পিওনের কাছে।
পরের দিনে চিলে কোঠার ঘরে
বন্ধু তারা নেমে এসে
বন্ধু পাতায় আমার সনে।
এরপরেতে নিত্য আলাপন –
গল্প গুজব প্রাণের কথা
বন্ধু তারা ভুলিয়ে দিল আমার
ভালো বন্ধু না পাওয়ার ব্যথা।
হঠাৎ করে বদলে গেল সব –
বন্ধু তারা আর এলো না ঘরে।
তাকিয়ে দেখি আকাশ পরে
আমার তারার পাশে আছে ভিনদেশী এক তারা।
নিজের দেশে বন্ধু তারা পেয়ে
আমার বন্ধু আর আসেনা চিলে কোঠার ঘরে।

শীত

নিগম সিকদার
১ম বর্ষ, কলাবিভাগ

পূজো শেষ শরৎ গেল, এলো শীতের বেলা
গাছে গাছে চলল এবার পাতা ঝরার খেলা।
লাল টুকটুক টম্যাটো বাঁধাকপির মেলা -
বাজার জুড়ে ফুলকপি বিন - তাও করিনা হেলা।
কড়াই শুটি, বিট, গাজর, ওলকপির ভিড়,
পেঁয়াজকলি, শালগম - মন রয়না স্থির।
ধনেপাতা, খেশারিশাক, পালং - ভারি খাশা,
কত কিছু খাব শীতে - করছি নিতুই আশা।
খেঁজুর গুড়ের তৈরী পায়েস - খাবো বাটি ভরে,
মুড়ির মোয়া, চিঁড়ের মোয়া খাবো পেটটি ভরে।
হিমেল হাওয়া - ট্রাঙ্কটি খুলে মা করছেন বের,
শাল -সোয়েটার, হাঁড়-কাঁপুনি - পাচ্ছি সবাই টের।
এরই মাঝে পরীক্ষাটা - মনটা বিকল করা,
ঠান্ডা আঙুল অসাড় যেন যায় না কলম ধরা।
সর্দি - কাশি, গা - টা গরম মনটা বেজার তাই,
শীতের পোষাক গায়ে চাপিয়ে শীতের গীতিই গাই।

লেখা

বুদ্ধদেব পন্ডিত
১ম বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা

ম্যাগাজিনে লিখব ভাবি
ছোট্ট একটা পদ্য।
যতই লিখি ততই কেবল
হয়ে যায় গদ্য,
কলম কাগজ সময় কালি
নষ্ট হয় কত।
ছোট একটি পদ্য লিখতে
হৃদয় হয় ক্ষত।
মনের দুঃখে শেষে আমি
ঠিক করলাম তাই,
পদ্য লিখতে বসব না আর
কান মুলছি ভাই।।

রক্তদান

শ্রোনালী সুতার
১ম বর্ষ, সাম্মানিক ইতিহাস

রক্তদানের মূল্য কি তা
যায় না বলা মুখে।
নতুন জীবন দান করে যে
চলতে একা পথে।
নতুন করে বাঁচতে শেখায়
তাইতো রক্তদান
মৃত্যুর ছায়া সরিয়ে ফেলে
জাগায় নতুন প্রাণ।
রক্তদানে জাতির নামে
নেই যে কোনও ভেদ।
একটাই তো দেশযে মোদের
যাই না থাকুক বেশ।
ধর্ম কিংবা জাতির বিচার
সেটাই বড় নয়।
রক্ত দিয়ে প্রাণ বাঁচালে
তাতেই পুণ্য হয়।

তল্লাশি

স্বরুপ মেটে
১ম বর্ষ, সংস্কৃত বিভাগ

মাম্মি বললেন কোথায় যাবি?
আমি বললাম, থানা
- যেখানে পারিস যানা।
বাপি বললেন যাচ্ছো কোথা ?
আমি বললাম, স্কুলে
- যাসনে কোথাও ভুলে।
দিদা বললেন কই যাবিরে ?
আমি বললাম, মাঠে
- এসে বসিস পাঠে।
দাদু বললেন যাস কোথারে?
আমি বললাম লেক-এ
- রাস্তা চলিস দেখে।
ভাই বললে চললি কোথা ?
আমি বললাম পড়তে।
- নাকি যাবি ক্লাব গড়তে।
বোন বলল বেরুস নাকি ?
আমি বললাম বাজার।
- আনিস কিছু সাজার।

জীবন

দিগন্ত ব্রহ্ম
দ্বাদশ শ্রেণী, বাণিজ্য বিভাগ

ছুটছে জীবন ছুটছি আমরা
ছুটছি আমরা টাকার পিছে,
গড়তে হবে কেরিয়ার ভাই
নইলে হবে সবই মিছে।
ইনক্লাব ধ্বনি দিয়ে আমরা
পাল্টে দেব সব কিছু
আমরা সবাই নেতা হব
কিম্বা নেতার কোন কিছু।
দেশপ্রেমিক হব আমরা
ধরবো হাল শক্ত হাতে
কিন্তু সবই মিছে লাগে
পথশিশুটি যখন কাঁদে
ছেঁড়া কাঁথা জড়িয়ে গায়ে
শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে
দেওয়াল জোড়া প্রতিশ্রুতি
গরিবের কোন কাজে লাগে
ছুটছে জীবন ছুটছি আমরা
ছুটছি আমরা টাকার পিছে।

দীন বন্ধু

সুজয় বিশ্বাস
প্রথম বর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

এই সমাজে লোটে পোটে সব
দান করবে কারা?
দান করে যে দীনের বন্ধু
ধন্য ওদের সেবা ॥
যারা দু:খীকে ভালোবাসা দেয়
গৃহহীনকে গৃহ,
প্রচারের তারা অন্তরালে
দীনের অতি প্রিয় ॥
মন্দিরে মূর্তি পাথরে গড়া
তাতে কি আছে প্রাণ,
যারা বিপদে মানুষের পাশে
তারাই ভগবান ॥
প্রতিবন্ধী সমাজ হয় তো
ওদের যাবে ভুলে,
আকাশ, বাতাস, আলো কিন্তু
রাখবে সদা কোলে॥

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই

ইন্দ্রনীল নাথ
প্রথম বর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

যুদ্ধ নয় শান্তি চাই
এসো আমরা হাত মেলাই
দেশে বিদেশে যুদ্ধ নয়তো –
দেশের মধ্যেই যুদ্ধ এতো।
সম্পদ নিয়ে লড়াই নয় –
ধর্ম নিয়েও যুদ্ধ হয়।
– এসো আমরা এগিয়ে যাই –
যুদ্ধ থামুক এইতো চাই।
আমরা একবৃন্তে অনেক কুসুম
হিন্দু মুসলমান।
জৈন, বৌদ্ধ, শিখ, সহজিয়া,
পার্সী, খ্রীষ্টান।
একজোটে এসো এগিয়ে যাই
হাতে হাত ধরে করি বাঁচার লড়াই।

The Truth

Munmun Saha
B.A. III Year, English Hons.

Life is like a sea-shore --
Where people come and go, sometimes few and sometimes more
Many people are there whom we meet,
But are not too lucky by fate to get it .
None is there to stand by in the long run,
Nobody is there to love like the undying Sun.
Arrival of all is like a cold wind,
But no arm to hold you or make your soul bind.
True love comes only once in life,
But all are not too lucky to get it.
It is like a magic, -- a gift,
Bestowed on human by God,
A spell cast on each and all,
Where the result is either success or downfall.
Sweet dreams are like the soft and gentle share,
Which can be broken down in a minute, by a strong storm and nothing more.

অভিসার

শ্রী শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

নিশামুখং মেঘঘনমেচকং
যমুনাপুলিনে তমালতলম্ ।।
অয়ি রাধে, এহি যদি তিষ্ঠতি
হরিসংগমে তে পরমা প্রীতিঃ ।।
ধূমতি মুরলী চলতি রাধা
হরিকেলিরসে নাশিত বাধা ।।
বজ্রতি শ্রীমতী কুঞ্জকুটীরং
ঝনঝনায়তে পাদনূপুরম্ ।।
কর্ণে কুণ্ডলং কনকবলয়ং
শোভতে করে প্রধ্মাতকাননম্।।
হারশোভিতা পীনপয়োধরা
বামলোচনা নিবিড় কুন্তলা।।
চম্পককান্তিঃ তিলপুষ্পনাসা
অলক্তরাগেণ রঞ্জিতপাদা।।
লোহিতাধর বিধৃতরঞ্জনা
কজ্জলাঙ্কিত হরিণনয়না ।।
একপংক্তি বদ্ধসিতদশনং
রাজতে শরচ্চন্দ্র ইবাননম্ ।।
অগুরুচন্দনচর্চিত দেহা
পুষ্পমালাভি রতিমনোহরা।।
করবীবদ্ধং ক্ষীণকটিতটং
মেখলাদাম্না শোভতেহপূর্বম্।।

মৃগবদ্দ্রুতং সা যাতুমিচ্ছতি
নিতম্বভারাত্তু বিম্বিতাগতিঃ ।।
মত্ত মাতঙ্গিনী সমা হি গতিঃ
প্রেমব্যাকুলা সা ত্বরয়া পতি ।।
গৃহাদ্ বহির্সতা যদা সা পথি
ঘনঘোরাকৃতিঃ তদা প্রকৃতিঃ ।।
গর্জতি মেঘো গগনে সরোষং
স্ফুরতি বিদ্যুৎ চকিতচকিতম্ ।।
সুখাবহং কর্তুং গমনমার্গং
দ্যোতয়তি বিদ্যুদ্ দীপ্তবিদ্যোতম্ ।।
উপকারিণ্যা হি প্রচেষ্টায়া সা
নিবিড়তিমিরে প্রত্যুত মগ্না ।।
বারিপতনপ্রহরণ ভীতাঃ
নাপি খদ্যোতাঃ পথি বহির্গতা ।।
মত্তপ্রভঞ্জনঃ উদ্ধত বৃক্ষং
বলাৎ পুনঃ পুনঃ করোতি নম্রম্ ।।
পুত্রকাতরা জননীব লতাঃ
ফলপুষ্পহীনা ভূমৌ লুটিতাঃ ।।
হস্তপাদহীনাঃ পুরুষা যথা
ভগ্নশাখা বৃক্ষ রুদন্তি তথা ।।

প্রচণ্ডবজ্রপতননিস্বনং
সহস্রমিব সিংহস্য গর্জনম্ ।
কাননে ভূত্বা হি প্রতিধ্বনিতং
করোতি দ্বিগুণং নিশাবিপদম্ ।।
বিদ্যুদ্ বিদীর্ণে সা পশ্যতি পথি
বিষধরসর্পা বিচরন্তীতি ।।
উন্নতমস্তকা কে হপি ভুজগা:
গমনোৎসুকাং তাং দংষ্টুমুদ্যতা: ।।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণেতি ক্রন্দতি সা
কোহ পার: তন্নাম্ন: অহো মহিমা ।।
কৃষ্ণনামোচ্চারণেন পন্নগা:
পলায়ন্তে মার্গান্নতমস্তকা:।।
ঝিল্লিস্বরেণ শৃগালরবেণ
নিশাভীষণা পেচকনাদেন ।।
কদাপি পততি যতি কদাপি
ক্রন্দতি কদাপি বা সা হসতি ।।
গত: শিথিলং বিধৃতকুন্তল:
জনয়তি বাধাং চঞ্চলাঞ্চল: ।।
নয়নাঞ্জনম্ অধররঞ্জনং
সর্বং চর্চিতং গতং বিগলিতম্ ।।
সিক্তবসনা মুখলিপ্তকেশা
বিজনে বনপথে একা হি সা ।।
কণ্টকাঘাতরক্তাপ্লুতদেহা
ঝটিকাবিক্ষিপ্তনিবিড়কেশা ।।
ভূমিবিললিতাম্বরাঞ্চলা
কাত্যায়নীব রণমদচলা ।।
করস্থখড্গেন দুর্দমাসুরান্
অপসারয়তি তথান্ধকারান্ ।।
পল্লবকরেণ মা গচ্ছ ইতি
বনবীথিকা তাং নিবারয়তি ।।

সমগ্রা পৃথ্বী চ বাধেত যদি
তথাপি ন স্যাৎ তিরোহিতা গতি: ।।
সমুদ্রাকর্ষনাৎ নদী হি যথা
প্রাণবল্লভায় যাতি রাধিকা ।।
বনে ইতস্ততো বিচরন্তী সা
যুধ্যতে নূনং বিরূপপ্রকৃত্যা।।
কুত্র বিরাজ ত্বম অয়ি নিষ্ঠুর!
নিবিড় তিমিরে মার্গং দর্শয়।।
নাস্তি কিং তব হৃদয়ে করুণা
প্রেম্নঃ দেবতা ইতি কিং ছলনা।।
লব্ধুমেব তব পরমং পদম্
সমাজবিবিস্তু লঙ্ঘিতো নূনম্।।
বদতি লোকো মাং কলঙ্কিনীতি
অবিদিতং ত্বয়া ন তু কিমপি।।
করোতি ছলনাং তথাপি কথং
ইত্যেবং ক্রন্দতি রাধা বিবিধিম্।।
নিমগ্নজনস্য সমুদ্রে যথা
রক্ষতি জীবনং তরনী তথা
দূরাৎ সা পশ্যতি প্রদীপ শিখাং
বাতায়ণমার্গাদ্ বহিরাগতাম্।।
জয়তি তস্যাঃ প্রবল প্রচেষ্টা
কিং ন লভ্যতে তু স্বকীয় শক্ত্যা।।
অবশেষে প্রাপ্তং পরমং পদং
রাধিকা জীবনং সফলং গতম্।।
জয়তু কেলিঃ রাধামাধবয়োঃ
যাতু মেলনং পুরুষপ্রকৃতয়োঃ।।

মরতে মরতে বাঁচা

নবকিশোর চন্দ
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

মরতে মরতে বেঁচে থাকা
বাঁচতে বাঁচতে মরা,
জাগতে জাগতে ঘুমিয়ে পড়া
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জাগা ।

উঠতে উঠতে পড়ে যাওয়া
পড়তে পড়তে ওঠা,
শিরদাঁড়াটা বাঁকতে বাঁকতে
মনুষ্যত্বই হাওয়া।

প্রতিশ্রুতি শুনতে শুনতে
আমরা সবাই বোকা,
কানামাছি খেলতে খেলতে
অন্ধ বনে যাওয়া।

লাভের হিসেব কষতে কষতে
লাভের ঘরে ফাঁকা,
আশায় আশায় দিন ভেসে যায়
মরতে মরতে বাঁচা।

এক ডালিয়া

স্মৃতি মন্ডল
১ম বর্ষ, সাম্মানিক 'রাষ্ট্রবিজ্ঞান'

মনের বীনায় হৃদয়ের সুরে, কথার ছন্দে একদিন সবাইকে আনন্দের সুর লহরীতে ভরিয়ে রাখতো, পূর্ণিমার রাত্রিতে চাঁদের কিরণকে করে দিত ম্লান। বসন্তের কোকিলের কুহু ধ্বনিকে ছাপিয়ে ভোরের রাগিনী সুরের মূর্ছনায় পরিবেশকে আবেগে দিত ভরিয়ে। মহুয়া ফুল এসে জানিয়ে যেত তার আগমন বার্তা।

আজ অপরাহ্নের বকের পাখায় লুকানো শেষ আলোকবিন্দুর অবসানের সাথে সাথে খবরটি এসে পৌছাল, 'ডালিয়া মৃত্যুশয্যায়', সংবাদটির আকস্মিকতায় প্রথমে কিছুটা বিহ্বল হয়ে পড়লাম। তারপর সেটা কাটিয়ে উঠলাম, একে একে সব মনে পড়ে গেল।

এই তো সেদিনের - কথা কদিন হলো মনটা বিষন্ন। তাই কাউকে কিছু না বলেই সকালে স্টেশনের দিকে রওনা হয়ে গেলাম। ট্রেন আসতে উঠে বসলাম। শীতের সকাল তাই ট্রেনটা একেবারেই ফাঁকা ছিল। আমার কামরায় আমি আর একটা মেয়ে ছিল। মেয়েটির বয়স প্রায় চোদ্দ পনের। গায়ের রঙ ধপধপে সাদা, মাথাভর্তি কোঁকড়ানো চুল, কমলালেবুর কোয়ার মত ঠোঁট, আর চোখ দুটো থেকে যেন নীলাভ দ্যুতি বের হচ্ছে। একবার তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না। তাই স্বভাবতই আবার তাকালাম। আমার মত সেও একা। তাই পরিচয় করার ছলে তার কাছে এসে বসলাম। ট্রেন চলছে হু হু করে। আর আমরা জমিয়ে গল্প শুরু করলাম।

মেয়েটির নাম ডালিয়া। গাঁয়ের নাম অচিনপুর। বাবা - মার একমাত্র সন্তান। তাই একটু জেদী ও খামখেয়ালী। ছোটবেলা থেকেই অসম সাহসী ছিল। কোন কিছুতেই তার ভয় ছিল না। পড়াশোনাতেও গভীর মনোযোগী ছিল। প্রতি বৎসরই প্রথম স্থানটি তার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। খেলাধূলাতেও সবার আগে। আর ছিল মিষ্টি মধুর গানের গলা একবার যে তার গান শুনেছে সে কোনদিনও ভুলতে পারতো না।

সেদিন এর শিল্পী মনের পরিচয় পেয়ে আমিও একটা গান গাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য একটুও দ্বিধাবোধ করলো না। তৎক্ষনাৎ গান শুরু করলো।

'আজ এই সুন্দর স্বর্ণালী সকালে
তোমার ছবি নিলাম এঁকে
আমার মনের খাতায়
জানিনা পাব কিনা
আবার তোমার দেখা।'

গান শেষ হতে জিজ্ঞাসা করলাম 'এগান'! আমার কথা শেষ করতে না দিয়েই হেসে বললো, 'তোমাকে দেখে, তোমার সাথে পরিচয় হয়ে আমার খুবভালো লেগেছে। মনে হচ্ছে তুমি আমার কত আপন। তুমি আমার মিষ্টি দিদি। তাই তো তোমায় নিয়ে এগান রচনা করলাম। তখন বুঝলাম এ বহুমুখী প্রতিভার সম্বন্বয়ে সৃষ্টি।

সব কিছুর মাঝেও মনটা কেমন যেন উৎসুক হয়ে রইলো। তাই নিজেকে কৌতূহলের সীমার মধ্যে না বাঁধতে পেরে জিজ্ঞাসা করলাম — 'তুমি এত সকালে একা একা কোথায় যাচ্ছ? উত্তরে যা বললো শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সে জানালো — 'জানো মিষ্টি দি, আজ আমি ভোরের বেলা একটা স্বপ্ন দেখেছি,' স্বপ্নটা হল — আমি একা একা ট্রেনে চড়ে কোথায় যেন চলেছি। ট্রেনটা হু হু করে আমায় একাকী নিয়ে চলেছে। অনেকক্ষন পর ট্রেনটি

এসে এক জায়গায় থামলো। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ, ট্রেনটি যেখানে থামলো ঠিক তার সামনেই একটি বড় ফুলের বাগান তার চারিদিকে কাঁটাতারের বেড়া। বাগানের মধ্যে শত ডালিয়া ফুল ফুটে আছে। আমি এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি। দেখে মনে হল তারা যেন মাথা দুলিয়ে ডাকছে। আমি ধীর পদক্ষেপে গেটের দিকে এগিয়ে চললাম। দেখি গেটের সামনে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে — 'Tresspassers will be prosecuted.'

থমকে দাঁড়ালাম, কি অবাক কান্ড! দরজাটি আপনা-আপনি খুলে গেল। বুকের ভিতর দুরু দুরু করছে। তবুও সাহস ভরে এগিয়ে চললাম। অনেক ফুলকেই জড়িয়ে ধরে আদর করলাম। তারাও যেন আমাকে পেয়ে খুশিতে মেতে উঠেছে। হঠাৎ কে যেন আমার কাঁধে হাত রাখলো। তাকিয়ে দেখি এক অতিশয় বৃদ্ধ। সাদা চুল ও সাদা পোশাকের মাঝে তাকে যেন কোন দেবদূত বলে মনে হল। আমি ভয়ে ভয়ে তাকে জিজ্ঞসা করলাম, 'আপনি কে?'

তিনি কথার উত্তর না দিয়ে গুরু গম্ভীর স্বরে বলে উঠলো, 'এখানে প্রবেশ করলে কি করে? দরজার সামনে কি লেখা আছে দেখনি?'

আমি হাত জড়ো করে বললাম, 'আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি আর কখনও আসবো না।'

তিনি বললেন 'এখানে একবার কেউ আসলে আর ফিরে যায় না। তুমি যে ফুলগুলি দেখছো এরাও তোমার মতো একদিন এখানে এসেছিল, কিন্তু আর ফিরে যায়নি। এখানেই ফুল হয়ে ফুটে আছে। তুমিও এখানে ফুল ফুটে থাকবে।'

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, 'আমাকে ছেড়ে দিন, আমি বাবা মার কাছে যাব। 'কিন্তু তিনি আমার কথায় কর্ণপাত না করেই হাতের কমন্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে আমার গায়ে দিতে দিতে মন্ত্র পড়তে লাগলো। আর আমি ধীরে ধীরে একটি সাদা ডালিয়া ফুল হয়ে গেলাম।

তারপর মা ডাকতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। শুনেছি ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্য হয়। তাই আমি কাউকে কিছু না বলে বেরিয়ে পড়েছি।

স্বপ্নটা শুনে আমার মন এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে উঠলো অনেক কষ্টে তাকে বুঝিয়ে পরের ... পড়লাম। তারপর তার বাড়ীতে দিয়ে আস... সময় কথা দিলাম 'আবার আসিব।'

আজ সকালে খবরের কাগজের টেলিগ্রা... মনটা বিষন্নতায় ভরে উঠলো, টেলিগ্রামটি ...

'মিষ্টি দি তুমি ফিরে এসো
আমি খুব অসুস্থ, হয়তো আমি
সত্যি সত্যি এবার ফুল হয়ে যাবো।'

আমি তখনই ট্রেনে চেপে সোজা তার বাড়ি ... দেখলাম বাড়িটার চারিদিক নিঃস্তব্ধ, থমথমে ... আমাকে দেখেই ওর মা হাত ধরে হাউ হাউ করে ... উঠলো। সান্ত্বনার ভাষা খুঁজে না পেয়ে বললাম, ... কোথায় মাসিমা?' তিনি আঙ্গুল তুলে ইশারা করে ... দেখিয়ে দিল।

ঘরে ঢুকেই আমি চমকে গেলাম এ কাকে ... আমি! খাটের উপর আধবোজা চোখে শুয়ে আছে ... কি ভীষণ রোগা হয়ে গিয়েছে! মুখের সে জ্যোতি ... নেই। সোনার বর্ণ কালি হয়ে গিয়েছে।

আমার পায়ের শব্দে চোখ মেলে তাকালে ... হাসি হেসে বললো — 'তুমি এসেছ, মিষ্টি দি!'

আমি তার কাছে বসে হাতটি ধরে বললাম — ... তোর কি অসুখ করেছে?

উত্তরে জানালো 'তোমার মনে আছে ট্রেনের ... তোমাকে একটা স্বপ্নের কথা বলেছিলাম।' আমি ... 'হ্যাঁ, হ্যাঁ মনে আছে, সেই ফুল হয়ে যাবার কথা ...

তারপর থেকেই আমি যেন কেমন হয়ে ... লাগলাম, আমার কোনোকিছু ভালো লাগত না। ... করলেই আমি সেই লোকটাকে দেখতে পেতাম। ... আমাকে ডাকছে।

আমি বললাম, 'তোর বাবা মাকে বলিস নি?' ... 'না কষ্ট পাবে বলে বলিনি।' জানো মিষ্টি দি, আমি ... ডালিয়া ফুল চাষ করেছি।

জানালা দিয়ে আমি দেখলাম সত্যি কি ভীষণ সুন্দর ... বড় বড় শুভ্র ডালিয়া ফুল ফুটে রয়েছে। তা থেকে ... একটা সাদা আলোক রশ্মি বের হয়ে ঘরটাকে আলোকি...

করে দিচ্ছে।

আমি বললাম, 'কিন্তু তুমি শুধু সাদা ডালিয়া ফুলই চাষ করেছ কেন?'

সে হেসে বললো, 'জানো না! আমিও তো একদিন ঐরকম সাদা ডালিয়া ফুল হয়ে যাবো।'

আমি মুখে হাত চাপা দিয়ে বললাম — 'চুপ কর! ঐরকম কথা আর কোনোদিনও বলবে না।'

আমি মাসিমার কাছে এসে বসলাম, 'মাসিমাওর কি অসুখ করেছে?

মাসিমা কাঁদতে কাঁদতে জানালো — সেদিন তুমি চলে যাবার পর হঠাৎ ওর মাথায় এক অদ্ভুদ ইচ্ছা জাগলো, ও সাদা ডালিয়া ফুল চাষ করবে। তারপর স্নান খাওয়া স্কুলে যাওয়া প্রায় সব বন্ধ করে দিয়ে ঐ ফুল নিয়েই পড়ে রইলো। কেবলি বাগানে গিয়ে বসে থাকতো।

একদিন বাগানে গিয়ে দেখি ও অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তাড়াতাড়ি বিছানায় এনে শুইয়ে দিয়ে ডাক্তারকে ফোন করলাম। ডাক্তার এলো, ওষুধপত্র দিলো। কিন্তু কোনে কিছুতেই কোনো ফল হল না। সকল রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও অসুখের কোনো কারণ পাওয়া গেল না। তারপর তোমাকে একদিন টেলিগ্রাম করতে বললো।

তারপর ওঘরে গিয়ে মাথায় হাত দিতেই আমার হাতদুটো ধরে বললো 'কথা দাও মিষ্টি দি, আমি চলে গেলে আমার বাবা মাকে দেখবে, ওরা ভীষণ একা হয়ে যাবে ওদের আর কেউ নেই, বলো তুমি ওদের ভার নেবে।'

দুচোখ দিয়ে অঝোরে জল ঝরছে, আমি কপালে একটা চুম্বন এঁকে দিয়ে বললাম, 'তোমার কিছু হবে না, তুমি আবার আগের মত হয়ে যাবে।'

সে রাতটা আমি ওর কাছেই থাকলাম, তখন ভোর পাঁচটা। হঠাৎ আমার মনে হল কেউ যেন ঘরে ঢুকেছে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি কেউ কোথাও নেই।

এমন সময় ডালিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ঘনঘন শ্বাস নিতে লাগলো। বুকের মধ্যে ঘড়্ঘড়্ শব্দ হতে লাগলো। আমি বললাম 'খুব কষ্ট হচ্ছে?' সে মাথা নেড়ে বললো 'হ্যাঁ'। তারপর আপন মনেই বলতে লাগলো, 'দ্যাখো মিষ্টিদি ঐ যে, সেই দেবদূত, সোনার রথ নিয়ে এসেছে আমাকে নিয়ে যাবে বলে। একটু দাঁড়াও আমি এক্ষুনি আসছি। আমি সারাজীবন তোমার বাগানের শ্বেত ডালিয়া হয়ে ফুটে থাকতে চাই।'

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম — 'মাসিমা মেসোমশাই দ্যাখো ডালিয়া কেমন করছে।'

ওরা ছুটে এল ডালিয়ার কাছে। মেসোমশাই ডাক্তার ডাকতে গেল। আমি ওর মুখ ধরে ডাকতে লাগলাম - 'এই ডালিয়া, তাকাও আমার দিকে। কথা বল।'

করুণ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তারপর চোখ বন্ধ করে নিল।

আমি হাত ধরে দেখলাম স্পন্দন থেমে গিয়েছে। বুকে কান পেতে দেখলাম বুকের মাঝে ধক্ ধুক্ শব্দ আর হচ্ছে না। বুঝলাম সবশেষ

তারপর ডাক্তার এল, নাড়ী টিপে দেখে বললো— 'She is dead.'

কান্নায় সবাই ভেঙে পড়লো। আমি কিন্তু কাঁদলাম না। কারন আমি জানি ডালিয়া মরে নি। সে বেঁচে আছে বাগানের শত শত শ্বেত ডালিয়ার মাঝে আর এক ডালিয়া হয়ে।

পুরানো সেই দিনের কথা

স্বাতী চক্রবর্তী
তৃতীয় বর্ষ, সাম্মানিক গণিত

না, আজ কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস নয়, সোস্যাল বা অন্য কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়। তবু আজ আমি কলেজে এসেছি। কলেজ ছাড়ার ছয় বছর পরে। ঢুকতে গিয়ে মনে হল জীবনে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি কলেজে একা ঢুকছি। প্রথমবার একা এসেছিলাম — কলেজের প্রথমদিন। সেদিন বাবা, মা কেউ ছিল না, কোনও বন্ধুও হয় নি। রজতও ছিল না।

রাস্তা দিয়ে পায়ে হেঁটে মাঠে এলাম। রাস্তাটা নতুন করে সাজিয়েছে। নতুন বিল্ডিংও করেছে। এই রাস্তা যেখানে মাঠে মিশেছে সেই প্রান্তে, শীতকালের দুপুর। মাঠে অনেক ছাত্রছাত্রী বসে আছে। আমাকে কেউ দেখতে পেল কিনা জানি না, কিন্তু আমি পেলাম, ... আর্টস-কমার্স বিল্ডিংয়ের ছায়ার নিচে বসে আছি, আমি, রজত, শুভেন্দু, পলাশ, অর্নব ও আমার ক্লাসের আরও কয়েকজন। আমরা ক্রিকেট খেলা দেখছি। হঠাৎ আমার ডানদিকে আবিষ্কার করলাম শ্রীময়ীকে। আমাদের বিভাগেই পড়ে। শ্রীময়ী হাসছে। অসাধারণ সুন্দর লাগছে। চারমাস হল একসঙ্গে ক্লাস করেছি, টুকটাক কথাও বলেছি,তবে কি, আগে ওকে হাসতে দেখিনি! নাকি আগে কখনও অমন সুন্দর করে হাসেনি। রজত হঠাৎ ঠেলা দিল - এই সৌরভ, কি দেখছিস, কাকে দেখছিস ? ও এত জোরে কথাগুলো বলল যে সবাই আমার দিকে তাকাল। শ্রীময়ী আর মনীষাও। মনীষা বলল - এই চল চন্ডীমেলায় যাবি, আজ তো মনে হয় কোন ক্লাস হবে না, বসে থাকতে আর ভালো লাগছে না। রজত রাজী হয়ে গেল, অগত্যা আমরা চারজনে একসাথে হাঁটতে হাঁটতে সখের বাজারের পথ ধরলাম। সম্ভবত সেদিনই আমাদের বন্ধুত্বের যাত্রা শুরু হলো।

"ও-দাদা, সরে দাঁড়ান, দেখতে পাচ্ছি না", ছেলেগুলো বলে উঠল। "সরি - ভেরি সরি" - আমার জন্য ছেলেগুলো খেলা দেখতে পাচ্ছিল না। একটু এগোলাম, পায়ের সামনে ঘাসের উপর হলুদ রঙের কোন খাতার মলাটের ছেঁড়া টুকরো পড়ে আছে। এটা কি রজতের সেই খাতার মলাট যেটা শ্রীময়ী ছিঁড়ে ফেলেছিলো। সম্ভবত না। সেটা কবেকার ঘটনা। শ্রীময়ী খুব সহজ, সরল, হাসিখুসি, ইনো সেন্ট একটা মেয়ে। সবার সাথে মজা করত, সবাইকে রাগাত, বাচ্চাদের মত আড়ি - ভাব করত কিন্তু নিজে খুব কম রেগে যেত। সেদিন রজত আর মনীষা আমাকে আর শ্রীময়ীকে নিয়ে রাগাচ্ছিল। সত্যি বলতে কি আমার বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু শ্রীময়ী প্রচন্ড রেগে গিয়েছিল। রজতের খাতা ছিঁড়ে দিলো। পড়ে রজত ও মনীষা অনেক সাধ্য সাধনা করে ওর রাগ ভাঙ্গায়। ওর মতে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সবচেয়ে পবিত্র সম্পর্ক, বন্ধু সবচেয়ে আপন। বাবা, মা, ভাই, বোন যেই হোক তাকে আগে বন্ধু হতে হবে। তাই বন্ধুত্বের মধ্যে প্রেম-ভালোবাসা, বন্ধুত্বের অদৃশ্য সূতোর বাঁধন ছিড়ে দেয়। বন্ধুত্ব চিরকালের সম্পদ। এই সম্পর্ককে অন্য কোনো রূপ দেওয়া যায় না। আমি কোনো কথা বলতে পারি নি।

এগোতে থাকলাম। মাঠ পেরিয়ে বাগানের মধ্যে দিয়ে ক্যান্টিনের সামনে এলাম। এই খানে একদিন আমরা খাওয়ার কম্পিটিশন করেছিলাম। রজত প্রথম, আমি দ্বিতীয়, মনীষা শ্রীময়ী দুজনেই অনেক পিছনে ছিলো। সেদিন খুব মজা হয়েছিলো। ক্যান্টিনে উপস্থিত সবাই আমাদের

খাওয়াতে উৎসাহ যোগাচ্ছিল। শ্রীময়ী হেরে যাচ্ছে বলে ওকে খ্যাপাচ্ছিল। আর মনীষা, ওতো অনেক আগেই হাল ছেড়ে দিয়েছিলো। এছাড়াও ক্যান্টিনে আমাদের প্রায়ই আড্ডা বসত। তার বিষয়, শেক্সপীয়র, শেলী থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ হয়ে, ব্রিটনি স্পিয়ার্স, আমীর খান অবধি গড়াত। শ্রীময়ী ওর মতামত এত সুন্দর করে গুছিয়ে বলত যে তার পর আমার আর কিছু বলতে ইচ্ছা করত না। রজত মাঝে মাঝে কানে কানে বলত - " কিরে, ছবির মত মনের ক্যামেরায় তোলা আছে, গলাটাও কি মনের টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করেছিস।"

মনীষা একটু ভিতু প্রকৃতির ছিল, আড্ডা দিতে গিয়ে একটু দেরী হল বা কলেজ পালিয়ে কোথাও যাবার প্ল্যান হলো, মনীষা ভেবে কূল পেতনা বাড়ীতে গিয়ে কি বলবে। যদিও আমরা কলেজ পালিয়ে তিনবছরে মাত্র তিনবার সিনেমা দেখেছি। একবার ফলতা, বা রায়চক আর একবার সায়েন্সসিটি গেছি।

তিনতলায় স্টাডি। মাঝে মাঝে পাসের ক্লাস ডুব মেরে স্টাডিতে পড়তে যেতাম। স্টাডির বাঁদিকে ছেলেরা , ডানদিকে মেয়েরা বসে। মনীষা ও শ্রীময়ী আমাদের মুখোমুখি বসত, আর সমানে ভেংচি কাটত। রজতও বাচ্চাদের মতো উল্টে ভ্যাঙ্গাত। আমি নিঃশব্দে হাসতাম। পড়াশুনো কিছুই হতো না।

আবার ঘুরে এসে মাঠ পেরিয়ে, কলেজ কোয়ার্টার পেরিয়ে রাস্তায় উঠলাম। ডানদিকে একটু এগোলে একটা পার্ক আছে। আমরা মাঝে মাঝেই যেতাম। শ্রীময়ী দোলনা চড়তে খুব ভালোবাসতো। আর আমি শুধু দূর থেকে ওর আনন্দমুখর উজ্জ্বল মুখটা দেখতাম। এই পার্কে বসে রজত কত কবিতা লিখত। পার্কটা আজ ফাঁকা। গেটে তালা।

এবার ফিরতে হবে। আবার মাঠে এলাম। এখানে আমরা শীতকালে, ব্যাডমিন্টন, ফ্লাইং ডিস খেলতাম। শ্রীময়ী আমার পার্টনার হতো। এর একটা লাভ ছিলো। আমি কখন হারতাম না। শ্রীময়ীর বায়না ছিলো ওকে হারানো যাবে না। সেই বটগাছ। এগোলাম। ঐতো, এখনও লেখাটা আছে। "শ্রীরানীভ মিত্র" শ্রীময়ীর আবিষ্কার। আমাদের চারজনের নাম থেকে একটা করে অক্ষর নিয়ে – শেষে বন্ধু।

আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোলাম। ক্লাসরুম নতুন রঙ হয়েছে। তাই আমাদের হাতের ছাপগুলো ঢাকা পড়ে গেছে। সব চিহ্ন মুছে গেছে। আগামীকাল বম্বে ফিরে যাব। সেই ব্যাস্ত জীবন। রজত কলকাতাতেই আছে। মনীষা এখানে নেই। দেখা হল না। কোথায় আছে জানি না। বোধহয় শ্রীময়ী জানত, ওকি আমার কথাও জানত।

কাল শ্রীময়ীর বিয়ে হল। কাল সারা দিনরাত খুব আনন্দ করেছি। আজ শ্রীময়ী শ্বশুরবাড়ি চলে গেল। ও খুব কাঁদছিলো। আমি কিন্তু স্বাভাবিক ছিলাম। কাল রজত বলল - "সৌরভ, প্রজাপতি অন্য ফুলে উড়ে গেল"। রাগলাম না। বেশ স্বাভাবিকই ছিলাম। তবে এখন এই পড়ন্ত রোদ্দুরে কলেজ ছাড়ার সময় চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে কেন? এতদিন কোথায় ছিল এত জল ?

জঙ্গলে ভুত

শীলাঞ্জন ভট্টাচার্য্য

দক্ষিণ ভারতের জঙ্গলে আমার একবার একই সাথে দারুণ ও নিদারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি আর মুরালি বলে আমার এক সহকর্মী কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের প্রতিনিধি হয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের নাগার্জুন সাগর ব্যাঘ্রপ্রকল্প পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। সেটা ছিল ১৯৮৭ সালের গ্রীষ্মকাল। নাগার্জুন সাগর ব্যাঘ্রপ্রকল্প-র জঙ্গলটার একপ্রান্তে শ্রীশৈলাম শিবভক্তদের অতি পবিত্র পীঠস্থান। এখানে কৃষ্ণানদী গভীর এক খাতের ভিতর দিয়ে পূবমুখী হয়ে বয়ে গেছে। সেই খাতের ধারেই শ্রীশৈলামের বিখ্যাত শিবমন্দির। শিবমন্দির থেকে খাতের ঠিক নিচে নদীর প্রবাহের পাশেই অতি পুরানো বটগাছ। এখানেই নাকি আদি শঙ্করাচার্য তার অদ্বৈতবাদ তত্ত্ব ধ্যান-এর মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। শ্রীশৈলামেই ব্যাঘ্রপ্রকল্পের অফিস। আমরা ওখানেই প্রথমে পৌছলাম।

সরকারী ভাবে পরিদর্শন করতে এসেছি। ফিরে গিয়ে দিল্লীতে রিপোর্ট পাঠাবো। ওখানকার প্রকল্পের লোকজনের তরফে আমাদের খাতিরের অন্ত ছিল না। প্রকল্পের সহ অধিকর্তা মিষ্টার সত্যমূর্তি আমাদের দেখভালের দায়িত্বে। সারাক্ষণ সাথে সাথে রয়েছেন। একটা জিপগাড়ী আর দুটি রাইফেলধারী ফরেষ্টগার্ড সর্বক্ষণের জন্য মজুত। যখন জঙ্গলের যেখানে যেতে চাইছি সেইখানেই নিয়ে যাচ্ছেন। যা দেখতে চাইছি তাই দেখাবার চেষ্টা করছেন। আর, সেই সাথে খাবার-দাবারের এলাহি আয়োজন। একটা ব্যাপারেই সত্যমূর্তিজী একটু অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু আমার চাপাচাপিতে রাজী না হয়ে আর উপায় ছিল না।

দক্ষিণ-মধ্যভারতে সেই সময় কয়েকবছর ধরে সাংঘাতিক খরা চলছে। অন্ধ্রপ্রদেশের এই অঞ্চলগুলিতে এমনিতেই খুব কম বৃষ্টিপাত হয়। তারপর, গত কয়েকবছর টানা খরার প্রকোপে মরুভূমির মত হয়ে উঠেছে। জঙ্গলের নালা, ডোবাগুলো শুকিয়ে কাঠ হয়ে রয়েছে। ক্ষীণ হয়ে গেলেও পশ্চিমঘাটের সজল অঞ্চল থেকে বয়ে আনা কৃষ্ণার জলধারাই এই নিদারুণ গ্রীষ্মে সমগ্র অঞ্চলের একমাত্র পানীয় জলের উৎস। জঙ্গলের বাঘ থেকে আরম্ভ করে তার শিকার - হরিণ, খরগোশ, বনশুয়োর সকল জানোয়ারই জল খেতে না পেয়ে মরবার পথে। তাদের বাঁচাতে ব্যাঘ্র প্রকল্পের থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সত্যমূর্তীজী আমায় জানিয়েছেন বেশ গর্ব করেই। কৃষ্ণা নদীর থেকে জল ট্যাংকারে ভরে নিয়ে জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় ওয়াটার হোল'গুলিতে দু-দিন দিন অন্তর ঢেলে দেওয়া হচ্ছে। ওয়াটারহোল জঙ্গলের মধ্যে ডোবা মত জায়গা, যেখানে জন্তু-জানোয়াররা নিয়মিত জল খেতে আসে। সত্যমূর্তিজীরা এইরকম কয়েকটা ওয়াটার হোল বেছে নিয়ে তাতে নিয়মিত কৃষ্ণার জল ঢেলে আসছেন। বাঘ, হরিণ, শুয়োর বাঁদর সবাই নাকি মহানন্দে সেই জল পান করে সুখে বেঁচে আছে। সত্যমূর্তিজীর কাছে আমি এই রকম একটা ওয়াটার হোলে সন্ধ্যা থেকে সারারাত কাটাতে চেয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, জলপানরত জানোয়ারদের চাক্ষুষ দেখব। জঙ্গলের বেশিরভাগ জানোয়ারই সাধারণতঃ বিকেল-সন্ধ্যা থেকে সারারাত জল খেতে আসে। বিশেষতঃ বাঘ, চিতাবাঘের মত নিঃসাড় শিকারীরা।

একটু গাইগুই করলেও সত্যমূর্তিজীকে বাধ্য হয়ে রাজী হতেই হল। পরিদর্শক দেখতে চাইলে না করাটা

অনুচিত হবে ভেবেই হয়ত। সমস্যাটা বেশী হল কোন ওয়াটার হোলের কাছে থাকা হবে সেটা নিয়ে। জঙ্গলের ম্যাপে ওয়াটার হোলগুলোর অবস্থান দেখানো ছিল। আমি সবথেকে কাছের ওয়াটার হোলটা বাছতেই সত্যমূর্তিজী আর তার সহকর্মীদের মুখটা কেমন যেন শুকিয়ে গেল। ধানাই-পানাই করে অন্য ওয়াটার হোলেও যেতে বললেন। তাতেই, আমার যেন কেমন সন্দেহ হলো, সংরক্ষণের ব্যাবস্থা নিয়ে যতটা দাবী করছে ততটা হয়ত নয়। জেদ চেপে গেল। বললাম - 'কারণটা কি আমায় বলতে হবে'। আমার স্বরের কাঠিন্যে একটু দমে গিয়ে সত্যমূর্তিজী - আমায় একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে ব্যাপারটা বললেন।

ওই ওয়াটার হোল যেখানে, সেখানে একটা ছোট্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিলো। জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূরে দূরে জংলি আদিবাসীদের বস্তি আছে। স্বাস্থ্যকেন্দ্র বলতে একটাই টালির ঘর। একজন কম্পাউন্ডারবাবু তার স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। ওষুধের একটা আলমারিতে কিছু ওষুধ। আদিবাসীরা মাঝে মাঝে এসে ওষুধ নিয়ে যেত। ক্বচিৎ কদাচিত একজন ডাক্তারবাবু এসে ওখানে সকাল থেকে দুপুর কয়েকঘন্টা দেখতেন - সেদিন আদিবাসীদের ঢল নামতো। বছর দশেক আগে একদিন হঠাৎ কম্পাউন্ডার গলায় দড়ি দেন। পুলিস আত্মহত্যা হিসাবে মেনে নেয়। কম্পাউন্ডারবাবুর স্ত্রী কম্পেনসেসন গ্রাউন্ডে সরকারী চাকরিটা পান এবং ঐখানে থেকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রটা চালু রাখেন। কিন্তু, বছরখানেকের মাথায় তাকে একদিন ঘরের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। একজন আদিবাসী ওষুধ নিতে এসে জানলা দিয়ে ঘরের মেঝেতে তার মৃতদেহ দেখে। চোখেমুখে নাকি আতঙ্ক ঠিকরে পড়ছে। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে বডি নিয়ে যায়। পোস্টমর্টেমে গলাটিপে হত্যা বলে জানানো হয়েছিল। অথচ ঘরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল। ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোন মানুষের উপস্থিতির চিহ্ন পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। পেলেও সে বন্ধ ঘর থেকে বেরোত কি কোরে ? - এ রহস্যের কোন কিনারা হয় নি। পরে, একজন বেপরোয়া বেকার চাকরীর লোভে কম্পাউন্ডার হয়ে ওখানে থাকতে গিয়েছিলো, দুদিন বাদেই সে নাকি পালিয়ে আসে - সে নাকি প্রথম রাত্রেই একজন বিশাল লম্বা লোককে তার বিছানার মাথার কাছে এসে দাঁড়াতে দেখেছে। দ্বিতীয় রাত্রে, সে টালির চালের বাঁশের থেকে একজনকে গলায় দড়ি দেওয়া অবস্থায় ঝুলতে দেখেছে। লোকটা নাকি তার দিকে ভয়ংকর ভাবে তাকিয়ে ছিল। লোকটা সেই রাত্রেই দরজা খুলে প্রাণপণ দৌড়তে থাকে জঙ্গলের পথ ধরে শ্রীশৈলামের দিকে। ঘন্টা চারেক একটানা দৌড়ে ভোরবেলা শহরের প্রান্তে এসে সে যখন পৌছায় তখন তার মৃতপ্রায় অবস্থা। তারপর, আর কাউকে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো যায়নি। পরিত্যক্ত অবস্থায় ঘরটা জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছে। এখন তার ভাঙাচোরা অবস্থা, ঐ ঘরটার পিছন দিকেই ওয়াটারহোলটা।

গল্পটা শুনে ওখানটায় রাত কাটাবার আকর্ষণ আরো বাড়লো। জঙ্গলে ভুত — how exciting - শহুরে ডানপিটে ছেলেদের যা মনে হয় আরকি। সত্যমূর্তিজীকে বললাম - 'don't worry, we will be together.' বেজার মুখে সত্যমূর্তি জোগারযন্ত্র শুরু করলেন।

পরেরদিন আমরা ফিরে যাব ব্যাঙ্গালোরে। কাজেই সেদিন লাঞ্চটা এলাহি হলো। জম্পেশ মুরগির মাংস, ডিম সাথে পঞ্চব্যাঞ্জন। সবই ভাল - শুধু কুখ্যাত অন্ধ্রা কিউজিনের ঝাল - এক্কেবারে যাকে বলে 'জ্বালামুখী' খাবার! ভরপেট খেয়ে রওনা দিলাম জিপে — সত্যমূর্তিজী, আমি, মুরালী আর দুজন রাইফেলধারি গার্ড। সন্ধ্যার ঠিক আগে জায়গাটায় পৌছলাম। ঘরটা দেখলাম ভেঙেচুরে, লতায় পাতায় জড়িয়ে গল্পের বইয়ের ভুতুড়ে বাড়ির মত দেখতে। একমাত্র দরজার একটা পাল্লা উধাও একটা ভেঙে আধঝোলা। ঐ ঘরে আশ্রয় নেওয়া সম্ভব নয়। ঘরের পিছনদিকে ওয়াটার হোলটার মধ্যে কাঠাদুয়েক জায়গা বেশ ফাঁকা। দু-তিনটে বড় সেগুন গাছ ছাড়া। গাছগুলোর আড়ালে আমরা ফোল্ডিং খাটগুলো পেতে ফেললাম।

সূর্য ডুবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নিঃস্তব্ধ হয়ে খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে আছি চোখ ওয়াটারহোলের দিকে আটকে আছে। আমি একদম ধারে, তারপর সত্যমূর্তি, তারপর মুরালী, শেষে গার্ড দুজন। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই পুরোপুরি অন্ধকার নেমে এলো তারমধ্যে একটা জানোয়ারের টিকি মিললো না। খানিক্ষণের মধ্যে চাঁদ উঠলো, পূর্ণিমা গেছে

বেশ ক'দিন হলো, আধখাওয়া চাঁদ। তবে ওয়াটারহোলে কোন জন্তু এলে বেশ বোঝা যাবে। মাঝে মাঝে মশা মারার ছোট্ট চড়ের আওয়াজ বা পাশ ফেরার শব্দটুকু ছাড়া পাশের জনের উপস্থিতি টের পাওয়া মুশকিল। আমি অন্ততঃ ওয়াটার হোল থেকে চোখ সরাইনি একবারও। হঠাৎ, ঠিক পাশেই সত্যমূর্তিজীর খাটের থেকে একটা বিদ্‌ঘুটে চাপা ঘড়ঘড়ে আওয়াজ এলো। চম্‌কে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি সত্যমূর্তিজী কখন চিৎ হয়ে ঘুমিয়ে অসাড়, নাকবাদ্য বাজছে মাঝে মাঝে। বিরক্ত লাগল এই শব্দে আর কোন জন্তু এলে হয়। মাথা তুলে দেখলাম মুরালী থেকে ফরেস্ট গার্ড সবাই একই ভাবে গভীর ঘুমে আশ্রয় নিয়েছে চাদর টাদর মুড়ি দিয়ে। চাঁদের আলোয় ঘড়িতে দেখলাম রাত মাত্র ন'টা। ওয়াটার হোলের দিকে চোখ ফেরালাম আবার। হোস্টেলবাসী নিশাচর আমি রাত একটার আগে ঘুম আসার কোন সিনই নেই, আর আজ এই পরিবেশে - নো চান্স।

কিন্তু, জানোয়ারের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আমিও কখন ঘুমের খপ্পরে চলে গেছি খেয়াল নেই। খেয়াল হল হঠাৎ পেটের মধ্যে একটা মোচড়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ায়। দুপুরের মুরগি আর ডিম শুকনো লঙ্কাবাটার তেজে তেজিয়ান হয়ে বিদ্রোহ করেছে। সামলানো মুশকিল হয়ে উঠলো। ঘড়িতে দেখলাম - রাত বারোটা মাত্র। কাউকে জাগিয়ে বলবার প্রশ্নই আসেনা - প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাবে। বিশেষতঃ মুরালী গিয়ে হোস্টেলে ফলাও করে বলবে। অসুবিধা কি প্যান্টের পকেটে তো একগোছা 'হাগজ' মানে টয়লেট পেপার মজুতই আছে। খাটথেকে নিঃশব্দে নেমে পড়লাম। ওয়াটার হোলের দিকে না যাওয়াই শ্রেয়। জন্তু-জানোয়ার আসতে পারে। তাছাড়া আমাদের কেউ জেগে গেলে গ্যালারির থেকে দেখার মত দৃশ্যটা দেখবে। ঘরটার অন্যদিকে অর্থাৎ দরজা যেদিকে সেদিকে গিয়ে বসার সিদ্ধান্ত নিলাম। ওপাশে গিয়ে, পড়ো ঘরের উঠানে দরজা টাকে পিছনে রেখে জঙ্গলের দিকে মুখ করে বসে পড়লাম। জন্তু - জানোয়রের ভয়ই মাথায় ছিলো। কিন্তু বসতেই পিছনে দরজার দিক থেকে একটা মৃদু কোন আওয়াজ হলো, আর, ভুতুড়ে ঘটনাগুলো মনে পড়ে গেল। গা- ছমছমিয়ে উঠল। আর, ঠিক সেই মুহূর্তে দেখলাম চাঁদের আলোয় একটা লম্বা মানুষের ছায়া আমার পিঠ বেয়ে সামনের উঠানে গিয়ে পড়লো। স্পষ্ট বুঝলাম, আমার পিছনে এসে কেউ দাঁড়িয়েছে। আমার সমস্ত হাত পা জমে বরফ হয়ে গেল। শহুরে সাহস, বিজ্ঞানের ছাত্রের যুক্তিবাদী মন তখন আমার প্রাকৃতিক বেগের মতই উধাও। শুধু একটাই অনুভূতি চরম ভয়ের, গলার স্বর সহ সমস্ত শরীর জমে বরফ।

ছায়ার মূর্তিটা দেখছি নড়ছে - মাঝে মাঝে মাথা কান, চুলের গুচ্ছ স্পষ্ট হচ্ছে আবার হারিয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে পড়ছে আমার দিকে। আমি যেন পিছন দিকে থেকে হাড়ের আঙুলওয়ালা দুটো হাত টের পাচ্ছি। আবার মূর্তিটা পিছিয়ে যাচ্ছে। হাড় হিম করা ভয়ের অনুভূতিতে কতক্ষণ কাটিয়েছি জানি না। হয়ত মিনিট খানেক হবে কিন্তু মনে হয়েছে অনন্তকাল। হঠাৎ একটা শব্দে ধড়ে প্রাণ ফিরে এল। মনে হল কেউ যেন মশা মারল চটাস্ করে। ছোট্ট শব্দটার মধ্যে একটা মানবিক অনুভূতি ছিল হয়তো। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলাম। পিছন ফিরে দেখি ফরেস্ট গার্ডদের একজন পিছনে কিছুটা দূরে দাড়িয়ে। প্রথমে ধড়ে প্রাণ ফিরে আসার আনন্দ হলো তারপরেই রাগ .... বেটা আহাম্মক। কি আর বলি? আমাকে নিজেই দাঁত বের করে জানালো - ও নাকি আমার ওঠার শব্দে ঘুম ভেঙে বুঝতে পারে আমি কি করতে চলেছি। তাই জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গার্ড দিচ্ছিল। এ কর্তব্যপরায়ণতার জবাব নেই। কিন্তু সে সময় আমার কি যে রাগ হয়েছিল।

যাই হোক, ফিরে এসে আবার ওয়াটারহোলে চোখ রেখে শুয়ে পড়লাম। বাকীরা যথারীতি ঘুমোতে থাকলো। বাকী রাতে একটাও জন্তু ধারে কাছে দেখা দেয় না। হতাশ হয়ে ভোর রাত্রের দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। সত্যমূর্তিজীর ডাকে ঘুম ভাঙলো। ফুটফুটে রোদের সকাল। সত্যমূর্তি ক্যাম্প খাটের উপর বসে। ইঙ্গিত করে খাটের নিচে জমিতে কিছু দেখতে বললো। দেখলাম ক্যাম্প খাটের চারপাশ জুড়ে চিতাবাঘের পায়ের ছাপ। তারপর, সেই বাঘ চলে গেছে ওয়াটার হোলের দিকে। ভাগ্যিস শেষরাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মাণিক বন্দোপাধ্যায় ঃ স্মরণে বরণে

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়
১ম বর্ষ, সাম্মানিক ইংরাজী

''সেদিন উতলা প্রাণে হৃদয় মগন গানে
লেখক এক জাগে'' –

শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে যায়, বয়ে চলে মানুষের অনন্ত প্রবাহ। সেখানে কত কবি, সাহিত্যিক, কত শিল্পী, বিজ্ঞানী, কত শ্রুতকীর্তি ব্যক্তিদের উদয় আর বিলয়। সেই অনন্ত প্রবাহের মধ্যেও কিছু নাম সর্বকালে সর্বদেশে স্মরনীয় হয়ে থাকে। প্রবোধচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ওরফে মাণিক বন্দোপাধ্যায় এমনই এক অবিস্মরনীয় ব্যক্তিত্ব। এমনই এক অবিনাশী মহিমাদীপ্ত ভারতীয় সংস্কৃতির বার্তাদূত। বহু যুগের ওপার থেকে আজও ভেসে আসে তাঁর কণ্ঠস্বর। জাতির জীবনে তা এক মহৎ প্রেরণা, শতাব্দী পারের অনাগত লেখকের জন্য তিনি রেখে গেছেন তাঁর অভিনন্দন লিপি।

যুগে যুগে কবি ও লেখকের আবির্ভাবধন্য হয়েছে ধূলির ধরণী। মানুষকে তাঁরা দেখিয়েছেন লেখনীর মাধ্যমে মুক্তির পথ। তাঁরা অন্ধকারে আলো, হতাশায় আশা, নিরাশ্রয়ে আশ্রয়। তাঁদের নিরলস জীবনসাধনা দুর্বল সংস্কারাচ্ছন্ন জাতির কাছে মুক্তির নির্দেশ। তাঁরা উত্তরপুরুষের জন্য রেখে যান মানবতার ঐশ্বর্য। তাঁরা সত্য পথের সাধক। তাঁদের কাছে সমগ্র দেশ ও জাতির অপরিশোধ্য ঋণ। তাঁদের স্মরণের মধ্য দিয়ে আমরা নতুন করে অনুভব করি সেই মহাজীবনের মহিমা।

লেখকের জন্ম ১৯০৮ খৃঃ ২৯শে মে, বিহারের দুমকা শহরে। পৈতৃক নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় 'বিচিত্রা' পত্রিকায়। গল্পের নাম -'অতসী মামী' (১৯৩৫) এর পর প্রকাশিত হয় প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), মিহি ও মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), বৌ (১৯৪৩), সমুদ্রের স্বাদ (১৯৪৩), ভেজাল (১৯৪৪), হলুদপোড়া (১৯৪৫), আজ কাল পরশুর গল্প (১৯৪৬), পরিস্থিতি (১৯৪৬), মাটির মাশুল (১৯৪৮), ছোটবড় (১৯৪৮) ছোট বকুলপুরের যাত্রী (১৯৪৯), লাজুকলতা (১৯৫৪)।

এরপর থেকে একে একে প্রকাশিত হয় 'দিবারাত্রির কাব্য', 'পুতুল নাচের ইতিকথা', 'পদ্মা নদীর মাঝি', 'অমৃতস্য পুত্রা', 'জননী', 'সোনার চেয়ে দামী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

মাণিক বন্দোপাধ্যায় ছিলেন বাস্তববাদী লেখক। তাঁর লেখনীতে তিনি সামাজিক মানুষের ক্ষত চিহ্নগুলিকে রূঢ় বাস্তবরূপে চিত্রিত করে অভিঘাত চিকিৎসার (Shock-Therapy) সাহায্যে তার লুপ্ত এবং সুপ্ত চেতনার জাগরণে হয়েছেন প্রয়াসী। তিনি নিজেই দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন '' আমি মার্কসবাদী, আমি বৈজ্ঞানিক, আমি সব জানি। সংস্কার বা ভাব-প্রবণতার আমি ধার ধারি না। আমি লড়ায়ে শ্রমিক শ্রেনীর যোদ্ধা কমিউনিস্ট – আমার হৃদয় পাথর।'' বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেন – মানুষের মনোজগতে থেকে গেছে অনেক ক্লেদ, অনেক পাপ এবং অনেক পঙ্কিলতা, 'সর্পিল' তার গতি - প্রবণতা, তাঁর লেখনির মধ্যে গড়ে উঠেছে শ্রমভিত্তিক একান্নবর্তিতা, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই নতুন চেতনার 'গায়েন', নতুন আদর্শের কথাকার, শরৎচন্দ্র ক্ষত চিহ্নগুলিতে বুলিয়ে দিয়িছেন সমবেদনার করস্পর্শ, তার ওপর করেছেন অশ্রুবর্ষণ, আর মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্মম ভাবে এবং অনেক সময় বীভৎসভাবে সমাজের ও সামাজিক

মানুষের ক্ষতচিহ্নগুলিকে রূঢ় বাস্তব রূপে চিত্রিত করেন। মানুষের মগ্ন-চেতনার স্তরে যে জৈবিক প্রেরণার [illegible] তাঁর যাত্রা শুরু আর এক নতুন সুস্থ সামাজিক জীবনবোধে তাঁর উত্তরণ। বাংলা সাহিত্যে তিনি সমাজ বাস্তব[illegible] জীবন দর্শন, সমাজ দর্শন ও শিল্প দর্শনের ক্ষেত্রে তাঁর একমাত্র সাদৃশ্য জার্মানীর ফ্যাসী-বিরোধী বিশ্ববি[illegible] বারটোল্ট ব্রেখটের সঙ্গে। যিনি বলেছেন "Fight through writings! Show thst you are [illegible] vigorous realism is on your side, be on the side of reality. Let life speak." [illegible] জীবনটাই ছিল সাহিত্য, সাহিত্যই ছিল তাঁর জীবন, এবং এই জীবনটাই ছিল এক আপসহীন সংগ্রামীর জীবন। তাঁর [illegible] মতে মানিক বন্দোপাধ্যায় সারা জীবনের অন্বেষণের প্রান্ত সীমায় এসে মেহনতী মানুষের মধ্যে খুঁজে পেলেন নারায়ণ-মূর্তি। সেখানেই তিনি পেয়েছেন জীবনের পূর্ণায়তির সন্ধান।

সাহিত্য তো শুধু জীবনের যথাযথ চিত্রাঙ্কণ মাত্র নয়, সাহিত্য সমগ্র দেশ ও জাতির আশা আকাঙ্খার [illegible] এক অভ্রান্ত পরিচয়পত্র সাহিত্যেই শোনা যায় অনাগত দিনের পদধ্বনি। শোনা যায় নতুন দিনের কণ্ঠস্বর।

আমাদের প্রার্থনা তিনি আমাদের জন্য যে উন্নত আদর্শ রেখে গেছেন তার আলোকে আমাদের হৃদয় [illegible] হয়ে উঠুক, যে ঐশ্বর্য তিনি রেখে গেছেন, তাতে আমাদের দীনতার অবসান হোক, আবার আমাদের আত্মশুদ্ধি[illegible] অকল্যাণকর তা অপসারিত হোক।

"অবশেষে সব কাজ সেরে
আমার দেহের রক্তে নতুন শিশুকে
করে যাব আশীর্বাদ।
— তারপর হব ইতিহাস।।"

স্বপ্ন

প্রকাশ কুমার জানা
(বাংলা সাম্মানিক, দ্বিতীয় বর্ষ,

"আঁখির সম্মুখে তুমি যে নাই
আখিঁ বুজিলেই তোমারে যে পাই"।.....

স্বপ্ন হল অবচেতন মনে ভেসে ওঠা কতকগুলো মানসচিত্র, হয়তো এলোমেলো কিংবা সু-শৃঙ্খলিত। শান্ত স্নিগ্ধ নিদ্রিত পৃথিবীতে নিদ্রাজনিত নয়নে ভেসে ওঠে নানা চিত্র দৃশ্য। সে সব দেখা চিত্র বা কাহিনী হয়তো অর্থহীন কিংবা অর্থপূর্ণ অথবা ভয়ঙ্কর। সাধারণভাবে স্বপ্ন বলতে আমরা এ সকলকেই বুঝি। কিন্তু এছাড়াও আমরা স্বপ্ন দেখি, "স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি"। সে সব স্বপ্ন আমাদের কল্পবিহারী। স্বপ্ন হল কল্পনার অতল সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া। স্বপ্ন দ্যাখে প্রত্যেকেই, সবারই নিজস্ব কিছু স্বপ্ন থাকে। স্বপ্ন মানুষকে জীবন ধারনের সঞ্জীবনী রস প্রদান করে, তাকে বড় হয়ে উঠতে সাহায্য করে। স্বপ্ন সৃষ্টি হয় মানুষের মনে, কিন্তু এই মন বড়ই অবুঝ। সে বাস্তব ও অ-বাস্তবকে গ্রাহ্য করে না। তাই স্বপন গড়ে ওঠে বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে। সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে স্বপ্ন তিন প্রকার, যথা—সুখ স্বপ্ন, দুঃখের স্বপ্ন এবং ভয়ের স্বপ্ন। পৃথিবীর প্রতিটি জিনিসই ভাল এবং মন্দের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর মধ্যে ভাল জিনিসটা গ্রহণ করাই ভাল-র লক্ষ্য। তাই তিন ধরনের স্বপ্নের মধ্যে সুখ স্বপ্নের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্বই বাঞ্ছনীয়। সুখ-স্বপ্ন রঙীন কাঁচের মত আমাদের চারপাশের বস্তুকে সৌন্দর্য মণ্ডিত করে রাখে। তাই স্বপ্ন দেখা শেষ হয়ে গেলে স্বপ্ন রূপ রঙীন কাঁচের অভাবে চারপাশের সৌন্দর্য আর তেমন থাকে না। তখন পৃথিবী শুধুই ধূসর। তাই পৃথিবীকে যদি সজীব, সচল, সবুজ প্রানবন্ত করে দেখতে হয় তাহলে আমাদের প্রত্যেককেই স্বপ্ন দেখতে হবে অবিরত। কিন্তু বর্তমান আধুনিক ধনতান্ত্রিক বস্তুবাদী সমাজে মানুষ স্বপ্ন দেখাকে তাদের বিলাসিতা বা অন্যায় বলে গন্য করে। প্রকৃতপক্ষে দৈনন্দিন কাজে তারা এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ে যে তারা তাদের কাজ শেষ করতে করতেই একান্ত ভাবে ক্লান্ত হয়ে যায়। তখন তাদের তাদের আর স্বপ্ন দেখার অবকাশই থাকে না। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না যে স্বপ্নই মানুষের মনে প্রেরণা সঞ্চার করে। তবে স্বপ্ন ছাড়া যে মানুষ জীবন ধারণ করতে পারবে না—এ কথা বলা আমার অভিপ্রায় নয়। তবে একথা বলতে পারি যে স্বপ্ন ছাড়া মানুষ অসম্পূর্ণ। কারণ স্বপ্নের জগতে একমাত্র সেই অধীশ্বর। যেখানে সে তার নিজের মতন করে তার জীবন ধারাকে 'দেখতে পারে, কল্পনার অজস্র জাল বুনতে পারে, ভবিষ্যতের পথ নির্ধারণ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মানুষ যে স্বপ্ন দ্যাখে তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য তাকে সচেষ্ট হতে হয়। তবেই সে ক্রমশঃ বড় হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু কেউ যদি তার সুখ স্বপ্নের কল্পনায় প্লাবিত হয়ে, সুখে আত্মহারা হয়ে নিজেকে অলীক সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে তবে তার স্বপ্ন কোনদিনও বাস্তবায়িত হতে পারে না এবং সে কোনদিনও প্রকৃত বড় হয়ে উঠতে পারে না। আবার স্বপ্ন নিত্য গড়ে তাতে। বিশ্বধরিত্রীর মহাঙ্গনে সূর্য যেমন পূর্বাকাশে উদিত হয়ে কিরণ বিকিরণ করতে করতে উজ্জলদীপ্ত হয়ে মধ্যগগনে বিরাজ করে তেজোদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং পশ্চিম প্রান্তে ক্রমশঃ এগোতে এগোতে অস্তমিত হয়ে পড়ে ম্লান গোধূলিকে গাঢ় অন্ধকারে পরিণত করে, তেমনি কারো স্বপ্ন বিফল হলে সাময়িকভাবে হয়তো তার মনে হতাশার অন্ধকার নামতে পারে। কিন্তু এরজন্য তাকে আশাহীন হয়ে পড়লে চলবে না। প্রকৃতি থেকে শিক্ষা নিয়ে তাকে দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে তার স্বপ্ন বিফল হয়েছে সত্য বটে, কিন্তু প্রভাতের উদীয়মান সূর্যের মত তার মনে যে পরবর্তী স্বপ্নের উদয় হবে তাকে সফলকাম করার জন্য তাকে ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে সেই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হবে।

স্বপ্ন মানুষকে সুস্থ, সবল এবং প্রত্যয়ী করে তোলে। তাই প্রত্যেকেরই স্বপ্ন দেখা উচিত যদি কোন মানুষের স্বপ্ন শেষ হয়ে যায় তাহলে তার অস্তিত্বও বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে ওঠে। বসন্তকালে বনফুল যেমন বিকশিত হয়, জলোচ্ছাস বর্ষায় যেমন পরিপূর্ণতা লাভ করে শ্যামল সুন্দর শস্য যেমন শরতে উৎফুল্ল হয়, নির্মল কুয়াশা যেমন হেমন্তে সর্বত্র আচ্ছন্ন হয়ে যায় তেমন সুন্দর সার্থক জীবন গড়ে তুলতে স্বপ্ন প্রত্যেক মানুষের একান্ত অবশ্য উপাদান।

ভাবীকাল ভয়ঙ্কর হবে

কুনাল কোটাল
দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা সাম্মানিক

ভারতীয় সংস্কৃতি বিশ্বের কোণে কোণে গৌরবের ঐতিহ্য বহন করছে। কিন্তু আমরা ভারতবাসীরা অনেকেই ভারতের এই ঐতিহ্যকে পদতলে পিষ্ট করে রঙচঙে, ঝকমকে মোড়কে মোড়া চটকদারি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির দিকে ক্রমশ ঝুঁকছি, যা অপসংস্কৃতির নামান্তর।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় — "দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে" — অর্থাৎ আমাদের দেশের ভাল জিনিস যেটি দেশ ও দশের সার্বিক কল্যাণ সাধন করে তা অন্যদেশকে দিতে হবে এবং অন্যদেশের ভাল জিনিস যা আমাদের দেশকেও প্রগতিতে সাহায্য করবে তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমরা নির্বিচারে পাশ্চাত্য দেশের বর্জনীয় বস্তুগুলিকে সাদরে সম্বর্ধনা জানাচ্ছি আমাদের সুস্থ সবল ঐতিহ্যকে অবহেলায় বিদায় জানিয়ে। একথার সত্যতা প্রমাণ করবার জন্য আমরা কয়েকটি দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে পারি।

সর্বপ্রথমে দূরদর্শন সম্বন্ধে আসা যাক। দূরদর্শনের কিছু চ্যানেল আছে যা চিত্ত বিনোদনের নামে আমাদেরকে যা দিচ্ছে তা আমাদের মূল্যবোধকে তিলে তিলে শেষ করে দিচ্ছে। এরই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ দেশী ও বিদেশী সিনেমা। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেতরুণ যুবকগোষ্ঠী। এরই সঙ্গে তাঁদের এই ক্ষতিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যায় কিছু ফ্যাসন পত্রিকা ও চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা এবং তথা কথিত কিছু সাহিত্য পত্রিকা। এই সব পত্র পত্রিকা কদর্য বিজ্ঞাপণ ও কুরুচিকর লেখার মাধ্যমে আমাদের যুব সমাজের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দিচ্ছে।

বর্তমানে কিছু জনপ্রিয় হিন্দি ও বাংলা সিনেমা অপরিণত শিশুমনে প্রভাব সৃষ্টিকারী বহু বিষময় উপাদান সুকৌশলে প্রবেশ করিয়ে দিচ্ছে। এর প্রভাবে তাদের ভবিষ্যত জীবন বিষময় হয়ে ওঠে।

কোন উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে কানে প্রবেশ করে লাউড স্পীকারে প্রচারিত হিন্দী ও বাংলা গান। এদের মধ্যে অধুনা অনেক গানেই আছে অত্যন্ত অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ভাষাও বিদেশী উত্তেজক সুরের অক্ষম অনুকরণ যা আমাদের যুব সমাজকে জীবনের মূল সমস্যাগুলি থেকে সরিয়ে এক... উন্মাদনার অথই সমুদ্রে নিক্ষেপ করছে।

এসব কিছুর পিছনে আছে এক শ্রেণীর স্বার্থ... মুনাফালোভী মানুষ। যাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ... বাজীমাৎ করে অর্থের পাহাড় তৈরী করা। তারা প্রতি ... তাদের কার্য সিদ্ধি করছে। এর পিছনে কিছু কারণ বি... রয়েছে। কারণগুলি হল ঃ-

প্রথমত ঃ আমাদের নড়বড়ে আর্থ-সামাজিক কাঠামো ... জন্য আমাদের দেশ ঐ সকল রাক্ষসরূপী মুনাফা ... মানুষদের প্রতি সঠিক পদক্ষেপ নিতে পারছে না।

দ্বিতীয়ত ঃ ছাত্র ও যুব শক্তি সত্যিকারের মাথা উঁচু ক... দাঁড়াবার ক্ষমতা দেখাচ্ছে না। কারণ বর্তমানে শিক্ষা ব্যব... প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠার মত শিক্ষা দেয় না। বর্তমানে ... ব্যবস্থার মূল নীতি হয়েছে যেন 'Learning for Earn... ছাত্র ও যুব শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করার মত চরিত্রবান প্রকৃত নেতা... অভাব।

তৃতীয়ত ঃ আমাদের মূল্যবোধ দিনরে পর দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে একটি সুন্দর সুসজ্জিত বাগানে পঙ্গপালের দল ঢু... বাগানটিকে যেমন তছনছ করে দেয়, তেমনি আমাদের সু... গৌরবময় সংস্কৃতিতে পঙ্গপালের দল প্রবেশ করেছে। ... আমাদের পরিবার ও সমাজকে কুরে কুরে খাওয়ার চে... করছে। এখনও অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে ওরা প্রবে... করতে পারেনি। এখনও সময় আছে ঐ পঙ্গপালের দল... রুখে দেবার। এখনও সময় আছে মূল্যবোধের ক্ষয় রো... করার।

এর জন্য চাই দেশের সবথেকে বড় শক্তি ছাত্র-যু... শক্তির নবজাগরণ। এই নবজাগরণের মন্ত্র হবে — ... বিবেকানন্দের সেই উক্তি — "জগতের সমুদয় ধনরা... চেয়ে মানুষ হচ্ছে বেশী মূল্যবান।" যদি ছাত্র-যুবশক্তি ... ওঠে এবং সঠিক নেতৃত্ব পায় তাহলে পঙ্গপালের দল ... কাঁপবে এবং পিছু হটতে বাধ্য হবে। তা না হলে ভাবীকাল ... ভয়ঙ্কর হবে না যুব তথা সমগ্র সমাজের নিকটে?

প্রকৃত বন্ধুত্বের উপলব্ধি

অন্তরা রায়
১ম বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ

প্রত্যেক মানুষেরই তার জীবন অতিবাহিত করার জন্য অন্যের সাহায্য অবশ্যই প্রয়োজন। অপরের সাহায্য ব্যতীত স্বল্প পরিসরের এ জীবন অতিবাহিত করা শুধু দুঃসাধ্যই নয়, তা এক কথায় অসম্ভব। তার একের অপরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এই আন্তরিক সাহায্যেরই অন্য নাম হল বন্ধুত্ব। বন্ধুত্ব হল এমনই এক আন্তরিক বন্ধন, যা কোন মূল্য দিয়ে ক্রয় কার যায় না। বন্ধুত্ব কোন বেড়াজালে আবদ্ধ থাকে না। এর বিস্তৃতি অসীম।

প্রকৃত বন্ধুত্ব জাতি, বর্ণ, ধনী-গরীব, উচ্চ-নীচ ছোট বড় প্রভৃতি নির্বিশেষে সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকতে পারে। কিন্তু বন্ধুত্বের এই ব্যাপ্তি মেটানোর জন্য সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন মনের উদারতা ও আন্তরিকতা, যা পরস্পরের হৃদয়কে নিকটে আনে এবং বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় ও সর্বাঙ্গ সুন্দর রূপ দান করে। হৃদয়ের এই নিকটতার জন্য প্রয়োজন সহনশীলতা ও হৃদয়ের অনুভূতিকে উপলব্ধি করার সূক্ষ্ম মানসিক বোধ। আর এই জন্যই প্রকৃত বন্ধুত্ব বারবার বয়স, ভাষা, ধর্ম, বর্ণের বিভিন্নতার উর্দ্ধে উঠে বিকশিত হয়েছে কেবল মানবতার সুসজ্জিত উদ্যানে। কিন্তু এই সুদৃঢ় বন্ধুত্ব বাস্তবিক জীবনে অল্প কিছু লোক ছাড়া সবার জীবনে স্থান পায় না। আবার অনেকে ভাল বন্ধু হতে চেয়েও হতে পারে না শুধু সামান্য কিছু মতানৈক্য ও অস্পষ্ট অনুভূতির জন্য। শৈশব থেকে বার্ধক্য অবধি প্রত্যেক মানুষের জীবনেই সাক্ষাৎ ঘটে বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট সম্পন্ন ব্যাক্তির সঙ্গে, আপাত দৃষ্টিতে এদের অনেককেই বন্ধু বলে মনে হলেও প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা সেখানে খুবই কম। আবার কখনো কখনো সারাজীবনে অনেক চরিত্রের সঙ্গে আলাপ ঘটলেও প্রকৃত বন্ধুর সাহচর্য্য অধরাই থেকে যায়। ব্যক্তি অনুভূতি নিকট হয় না বলেই বন্ধুত্বের এই অসম্পূর্ণতা সর্বদাই বর্তমান থাকে।

পিতা মাতার সাথে সন্তানের সম্পর্কও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধুত্বের প্রতীকী উদাহরণ রূপে প্রকাশিত হয়। একজন ছাত্র বা ছাত্রী তার শিক্ষক বা শিক্ষিকার কাছ থেকে তখনই সম্পূর্ণ বিদ্যার্জনের উপযোগী হতে পারে যখন সে তার শিক্ষক বা শিক্ষিকার সঙ্গে এক শ্রদ্ধাপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে।

বন্ধুত্বের ব্যাপ্তি কিশোর বা কিশোরীদের মধ্যেই সর্বাধিক পরিলক্ষিত হয়। তবে তাদের মধ্যে 'বন্ধুত্ব' নামক শব্দটি প্রচলিত থাকলে ও তার অন্তর্নিহিত অর্থ তাদের অধিকাংশই অনুধাবন করতে পারে না। ফলে বন্ধুত্বের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা, সহমর্মিতা ও অন্যের হৃদয়কে অনুভব করার আনন্দ তাদের কাছে অজানাই থেকে যায়। এই কারণেই অনেক সময় তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে দেখা দেয় অব্যক্ত কিছু ভুল বোঝাবুঝি যা এই বন্ধুত্বের দীর্ঘবিস্থানের পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা আর তাই প্রত্যেক কিশোর বা কিশোরীর উচিত তাদের মানসিক বোধকে সুদৃঢ় করে নিজেকে প্রকৃত বন্ধু হিসাবে গড়ে তোলা। এভাবেই প্রকৃত বন্ধুত্ব হয়ে ওঠে অনিন্দ্যসুন্দর এক অনুভূতির বাস্তব চিত্র।

'সুসময়ে বন্ধু বটে অনেকেই হয়, অসময়ে হায় হায়
কেহ কারো নয়।'

মশক সংবাদ

মানস মণ্ডল
১ম বর্ষ, সাম্মানিক 'দর্শন'

স্বপ্নে জানি না, আমি কখন মশাদের দেশে চলে গেছি। না-না জন্য কোথাও নয়, আমাদের পাড়ার শেষ সীমানায় একটা পচা ডোবায়। সেখানে মশক বাংলা টি.ভিতে মশা সুন্দরী তখন খবর পড়ছেন—

আজকের বিশেষ বিশেষ খবর হলে — ঘোষদের নালায় মশককুলের সভা, মশাদের মহানুভবতায় পৃথিবী জুড়ে প্রশংসা, মশাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রীরা ঘায়েল, মিস্টার অ্যালেক্স এনোফিলিস বডি- বিল্ডিং প্রতিযোগীতায় জয়ী।

মশারা ঘোষদের নালায় সভা করছে 'সভা প্রতিনিধিত্ব করতে কচুবন, পচা পুকুর গোল দীঘি ও খাল পাড় থেকে ছোট বড়ো মেজো সেজো-ন সবরকম মশক নেতা হাজির হয়েছে। ঐ সব জায়গায় ডি.ডি.টি ছড়ানোর প্রতিবাদ ও জঙ্গল পাড়ায় বাঁশ বাগান কেটে ফেলার জন্য ধিক্কার জানাতে তাদের এই সভা। এই মাত্র খবর এলো যে, একদল মশা ও তাদের পরিবারের সদস্যরা চৌধুরী বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে কলা-বাগান উদ্বাস্তু কলোনীতে হাজির হয়েছে। অল-আউট নামক এক মারন গ্যাসের অত্যাচারে তাদের অধিকাংশই অচেতন অবস্থায় আছে। অপর দিকে মশারা খাল পাড়ের রক্তদান শিবিরে ১৬৫ মি.লি রক্তদান করেছে দুস্থ প্রতিবন্ধী এবং কামড় দিতে অপারগ মশারা এতে উপকৃত হবে। এক উটকো ব্যবসায়ীর চায়ের কাপে পড়ে দুই মুরুব্বি মশার মৃত্যু ঘটেছে। ওদিকে ঘোষেদের গোয়ালে ঝুল-কালো অন্ধকার সন্ধ্যায় এক চমৎকার অনুষ্ঠানে মিস্টার অ্যালেক্স এনোফিলিস মিস্টার ঠাকুর পুকুর বিবেচিত হয়েছেন। এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন যে গতবছর বর্ষায় সুবুদ্ধিপুর এলাকায় তাঁরই দুর্বুদ্ধিতে ম্যালেরিয়ায় শয্যাশায়ী হয়েছেন অনেক স্থানীয় মানুষ।

খবর আজ এ পর্যন্তই পরবর্তী সংবাদ রাত ১২.৩৫মি. ৪০ সেকেন্ডে।

ছাগলের ধর্মঘট

সন্তু ঘোষ
১ম বর্ষ, বাণিজ্য বিভাগ

জামাই ষষ্ঠীর দিন খুব আড়ম্বর সহকারে ছাগল কাটা হয়। কেষ্টু ও কৃষ্ণ গয়লা জয়ন্তর কাছ থেকে ১৫০টি ছাগল কিনল। হত্যা কান্ডের প্রতিবাদে দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গেল সব ছাগল। কিন্তু আটটি ছাগল বিদ্রোহী ছাগলের দলে যোগ দিতে পারল না, কারণ তারা দড়ি ছিঁড়তে পারেনি। নির্দিষ্ট সময়ে হাটতলায় (ছাগল কাটার স্থান) উপস্থিত হলেন গ্রামের স্কুল মাষ্টারমশাই। একবার কর্মশিক্ষার ক্লাস চলাকালীন একটি ছাগল একটি গরুকে লাথি মেরেছিল। এজন্য মাষ্টার মশাই ছাগলটির ১০০ বার উঠবোস করিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁকে সকলে ভয় করে। ছাগলগুলি মাষ্টার মশায়ের উপস্থিতিতে যে ভরসা পেয়েছিল, তাঁর কথা শুনে সেই ভরসা হারিয়ে গেল তারা ভাবল, স্যার তাঁর বৃহৎ কর্মজীবনে সকলের সমান বিচার করতেন। তবে কেন তিনি বললেন যে শীঘ্রই কাটা না হলে জামাই বাবাজীর অফিসের দেরী হয়ে যাবে। ছাগলছানারা বুঝে পেলনা কেন তিনি তাদের প্রতি অবিচার করছেন। কিছুক্ষণ পর হাটতলায় গ্রামের ডাক্তারবাবু আর্বিভূত হলেন। ডাক্তার অবতার ডাক্তার বাবুকে দেখে তারা ভাবল তিনি হয়তো কনকনে টেডভ্যাক দিতে এসেছেন। তারা ভাবল ডাক্তারবাবু বোধ হয় তাদেরকে রক্ষা করতে এসেছেন। কিন্তু তিনি বললেন বড় কলিজার মাংস দাও নাহলে গিন্নির রুচি হবে না। বিদ্রোহী ছাগলগুলি শ্লোগান দিল —

'পৃথিবীর সব তরুন ছাগলেরা এক হও
এক হও'

তবু তারা ক্ষান্ত হল না। তারা ঠাকুরপুকুর, প্রফুল্ল রোড, শিয়ালদহ স্টেশন, ধর্মতলা ও খিদিরপুর ডক অবরোধ করল। তাদের সর্বাধিনায়ক অভিরাম ওরফে নিউটনের অনুরোধে আপনারাও এই বিক্ষোভে যোগদান করে ধর্মঘটকে সফল করুন এবং উচ্চৈস্বরে বলুন —

অরুন ছাগলেরা দিয়েছে ডাক
স্যারের চাকুরি চলে যাক।

ছাগল জাতিরা দিয়েছে ডাক
ডাক্তারবাবু মারা যাক।

সাম্রাজ্যলোভীদের রক্তচক্ষু

সৈকত ঘোষ
১ম বর্ষ, সাম্মানিক বাণিজ্য

সকলবেলায় নিদ্রাচ্ছন্ন চোখে সংবাদ পত্রে দৃষ্টিপাত করেই চোখে পড়ল ভয়াবহ, দুর্বিসহ এবং অবশ্যই লজ্জাজনক সেই সংবাদ — 'আমেরিকা আঘাত হেনেছে ইরাকে।' বুঝতে পারলাম আমেরিকার লক্ষ্য নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্যের তৈলভান্ডার। আর এর পরিণাম হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু। নব্যযুগের এই আধুনিকতায় দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অন্যতম শক্তিধর দেশ, তার শক্তিবলে দখল নিতে চায় মানব সাম্রাজ্য তথা এই পৃথিবীকে।

বর্তমান সমাজের মানুষ যথেষ্ট সচেতন। অথচ এই সচেতন সমাজেই চলেছে 'মরণের হোলী' মৃত্যুর লীলাখেলা। মানুষের তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রস্তুত বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম আজ ব্যবহৃত হচ্ছে মানুষেরই মৃত্যুতে। সত্যি! ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস। কিন্তু বিজ্ঞান কি নিজেই নিজেকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে? কখনোই না। তাকে নিষ্ঠুর করে তুলছে কিছু সাম্রাজ্য লোভী মানুষের আসুরীক মনোভাব।

এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু সুযোগ সন্ধানী টি.ভি চ্যানেল 'মানুষের রক্তে খেলা হোলী' তথা যুদ্ধকে পণ্য করে বেচতে চায়। তারা যুদ্ধ চলাকালীন দর্শকদের কাছে প্রশ্ন রাখে, 'আমেরিকা ইরাকে হামলা করতে যে মিশাইল ব্যবহার করছে তার নাম কি?' সঠিক উত্তরদাতা পাবেন প্রচুর আকর্ষণীয় পুরস্কার। কিন্তু আমি যদি সেই মূর্খ চ্যানেলকেই প্রশ্ন করি যে মার্কিন বোমা প্রথম কোন নিষ্পাপ মানুষের প্রাণ নিয়েছে, তারা কি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে?

অবশ্য বেশ কিছু সচেতন মানুষ এর প্রতিবাদ করেছেন। কিন্তু, সচেতন মানুষের এই প্রতিবাদকে মার্কিন শাষকরা তাদের রক্তচক্ষু দিয়ে শাষন করেছে। সচেতনতা পদদলিত হয়েছে অসচেতনতার দ্বারা। যুদ্ধে সাম্রাজ্যলোভীরা জয়লাভ করলেও পরাজিত হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে। কারণ, সাধারণ মানুষের মনে আজ তারা ভয়ঙ্কর, মানব সভ্যতার কলঙ্ক।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব তারা যদি কিছু মানুষের মুখের হাসির মাধ্যমে প্রচার করত, তাদের ধনসম্পদ যদি সভ্যতার উন্নয়নে ব্যবহার করত তাহলে এই বিশ্বের প্রতিটি মানুষের কাছে তারা হয়ে উঠত নিঃসন্দেহে 'শ্রেষ্ঠ'। এখানেই তাদের পরাজয় এবং এখানেই মানবসভ্যতার জয়। যে জয় যুগে যুগে স্থায়ী হবে। তাদের রক্তচক্ষু কখনোই তা গ্রাস করতে পারবে না।

যেভাবে যুগে যুগে সাম্রাজবাদী দলকে শাষন করেছে মহাকালের নিয়ম, সময়ের গতিশীল স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ধ্বংসাত্মক শক্তিকে, সেভাবেই আমেরিকা একদিন চলে যাবে লোকচক্ষুর আড়ালে। কালের নিয়ম অনুযায়ী তারাও একদিন হারিয়ে যাবে ইতিহাসের পাতায়। তাদের ধ্বংসাত্মক মনোভাব স্থান নেবে ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়ে।

অভিজ্ঞতা

অমিত কুমার সাহা
প্রথম বর্ষ, সাম্মানিক বাংলা

শীতের সময়, চারিদিকে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কিন্তু প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগের পূর্ণিমার রাত। আকাশে একটি পূর্ণ রুটির মতো চাঁদ উঠেছে, তারপর তারাদের মিটিমিটি আলো - সব মিলিয়ে পথঘাট আলোকিত হয়ে রয়েছে। মনে হয় যেন চন্দ্ররূপী সূর্যের পুনরায় আবির্ভাব ঘটেছে। কন্‌কনে ঠাণ্ডা পড়ায় স্বভাবতই এই সময় অর্থাৎ প্রায় রাত দশটার সময় পথ ঘাট নিঃঝুম। রাত তখন দশটা সবেমাত্র লোডশেডিং হয়েছে। এমন সময় কোথা থেকে লোকজনের চিৎকার শোনা যাচ্ছে। সবাই মুখে মুখে বলছে যে ডাকাত পড়েছে। অনেকে তাই ভালোকরে দরজা-জানালা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইলো। সবাইয়ের গা ছমছম করছে, এই বুঝি ডাকাত তাদের বাড়ি ধাওয়া করলো। সকলের ব্যক্তিত্ব সকলের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা একই সুতোয় গাঁথা নয়। তাই কিছু কিছু লোক বেরিয়ে পড়েছে বাড়ি থেকে এবং সেই চিৎকারকে লক্ষ্য করে ছুটে চলেছে। থম্‌থমে পরিস্থিতিতে সামান্যতম চিৎকার হলেও সমস্ত জায়গাটা যেন গমগমিয়ে ওঠে। এরই মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যে দূরে একটি বাড়িতে মনে হয় আগুন লেগেছে। সেখানে কিছু লোক যেন গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আর হা - হুতাশ করছে। বিরাটদা রাত জেগে পড়াশোনা করে, তাই তার দশটা মানে কিছুই নয়। এই চিৎকার শুনে বিরাটদাও গায়ে কোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল এবং আগুনের সামনে উপস্থিত হলো।

বাড়িটি চার-পাঁচটি ঘর এবং বৈঠকখানা রয়েছে। বাড়িটার চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এবং মেনগেট লোহার তাই কেউ কেউ বাড়ির ভিতরে যে কজন চিৎকার করছে তাদের বাঁচানোর উদ্দেশ্যে পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে কিন্তু বাড়ির ভিতরে গিয়ে দেখে যে একেবারে ঘরটিতে আগুন লেগেছে এবং সেই আগুন বীভৎস ছড়িয়ে পড়েছে।

এই আগুন দেখে কেউ সাহস করলো না ঢুকতে। ভিতরে একটি মহিলা এবং তার দুটি কন্যা করছে। সেই আর্তনাদ ভয়ঙ্কর। এই বিপদের মু তার কন্যাদের জীবন বাঁচাতে অসমর্থ। কিন্তু তারা কি পারে না? তাদের বাঁচাবার মতো কেউ এখানে নেই বিরাটদা তখনই ঘরের দরজার সামনে গেল কিন্তু ভিতর দিক থেকে লক করা আর এই দরজার আগুন। সবাই মিলে দরজায় আঘাত করাতে দরজা গেল কিন্তু অদ্ভুত আগুন। দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের ফুলকি যেন বাইরের দিকে ধাবিত হচ্ছে চারিদিকের আর্তনাদ অপেক্ষা ভিতরে তিনজনের আরও করুণ হয়ে উঠেছে।

ভিতরে মহিলাটির আঁচলে তখন আগু গেছে কিন্তু কি করবে তখন, মেয়ে দুটিকে বুকে আর্তনাদ করা ছাড়া করার কিছু নেই, এদিকে সকলে সত্ত্বেও বিরাটদা ঘরের মধ্যে ঢোকে এবং দু মেয়েটিকে নিয়ে বের হতে যাবে এমন সময় কে দেখতে পেল না। এখানে সেখানে ধাক্কা খে আগুনের উপর দিয়ে বেরিয়ে আসে, এবং বাইরে রাখে। বিরাটদার পরনের মোটা জিন্সের প্যান্ট থাকায় অনেকটা আগুন প্রতিরোধ করতে এরপর ছোট্ট মেয়েটির মাকে বাঁচাতে বিরাটদা ভিতরে

এবং মহিলাটির আঁচল ছিঁড়ে দিয়ে তাঁকে আগুন থেকে বের করে আনে। কিন্তু নিজে বেঁচেও তার শান্তি নেই, তাঁর আরও একটি কন্যা তখনও বাড়ির মধ্যে, অগ্নির মধ্যে দাহ হবার পথে চলেছে। মেয়েটি খাটের উপর বসেছিল কিন্তু খাটও আগুনের হাত থেকে বাঁচে নি, এর ফলেই মেয়েটির জামায় আগুন ধরে যায়। এদিকে বিরাটদা আগুনের সঙ্গে লড়াই করে হাঁপিয়ে উঠেছে। মায়ের বুক ফাটা করুণ আর্তনাদ এবং ঘরের ভিতরে মেয়েটির জীবন বাঁচাবার জন্য প্রার্থনা বিরাটদাকে নতুন উদ্যম এনে দিল। এহেন সময় বিরাটদা জ্বলন্ত আগুনের ভিতর দিয়ে ঘরে ঢুকে দেখলো যে মেয়েটির সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গেছে। তবুও বিরাটদা তাকে ধরে নিয়ে বাইরে বের হয় এবং ফাস্ট-এইডের নিয়ম অনুযায়ী মাটিতে কয়েকবার গড়িয়ে দিয়ে তাদের শরীরের আগুন নেভায়। আগুন নেভাবার পর মেয়েটির বস্ত্রের অধিকাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।বিরাটদা এই সময় অনেকটাই জখম হয়ে পড়েছিল।কিছু সময়ের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্স ও ফায়ারব্রিগেড এসে যায়। ফায়ার ব্রিগেডে করে তিনজন মহিলা এবং বিরাটদাকে তুলে নিয়ে চলে যায়। ডাক্তারের রিপোর্ট অনুযায়ী বিরাটদার গায়ে অল্প আগুন লাগলেও ভিতরে ভিতরে তার প্রচণ্ড ক্ষতি হয়েছিল এর জন্য সামনের এম. এ. পরীক্ষা দিতে পারেনি।

এই ঘটনা আমার জীবনের একটা বড় অভিজ্ঞতা। এই ঘটনা সমস্ত মানুষের মনকে অনুপ্রাণিত করে মানুষের প্রতি দায়িত্ব কর্তব্য পালনে। সকলে যখন ডাকাতের ভয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে তখন বিরাটদা দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। আসন্ন মৃত্যু জেনেও সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে কয়েকটি মূল্যবান জীবন বাঁচাতে। এমন মানুষের ব্যক্তিত্ব কর্তব্যনিষ্ঠা মনে রাখার বিষয় নয় কি? ঐ তিনটি গৃহদাহে দগ্ধ মহিলা কি আজ বিরাটদার কাছে ঋণী নয়? তবে এই ঋণ অর্থ দিয়ে সম্পদ দিয়ে পূরণ করা যায় না। কর্তব্যের খাতিরে মানবতার তাগিদে সে যেমন নিজের জীবনকে তুচ্ছ করেছে তেমনই ভাবে তাকেও নিজেদের মনে করে তাকে আপন ভেবে ভালোবেসে তাদের কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।

কর্ণাটকে ভ্রমণের দিনলিপি

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য
২বর্ষ, সাম্মানিক প্রাণীবিদ্যা

'সাউথ ইণ্ডিয়ায় গেলে তিনদিন পর থেকে আর কোনো খাবার মুখে তুলতে পারবি না', 'সবকিছুতে নারকেল তেলের গন্ধ', 'ওখানকার লোকগুলো না বলে হিন্দি না বোঝে ইংরেজি', এসব নানা মন্তব্য ও উপদেশ শুনতে শুনতে এক্সকারসন-এর জন্য কেনাকাটা ও ব্যাগ গোছানো শুরু করেছিলাম ৩-৪ দিন আগে থেকেই। আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে রওনা হয়েছিলাম ২৮শে জানুয়ারি করমন্ডল এক্সপ্রেসে। দুপুর ২-৩০ টায় ট্রেন। কিন্তু উত্তেজনার চোটে আমি আমার প্রচন্ড ভারী ব্যাগটা নিয়ে বেলা ১২টার মধ্যেই পৌঁছে গিয়েছিলাম। যা হোক সবাই এলে আমরা ট্রেনের দিকে রওনা দিলাম। কিন্তু সেখানে বিপত্তি। আমাদের কম্পার্টমেন্টে পৌঁছতে প্রায় কমবেশী মাইল খানেক হাঁটতে হল। যা হোক, মালপত্র রেখে বাইরে বাবা-মা-মামার সাথে যখন কথা বলছি তখন মার মুখ দেখে মনে হল, আগামী দিনগুলিতে কি যে দুঃসহ কষ্ট আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে মা যেন তা প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে। আমাদের প্রায় সীমান্তে যুদ্ধ করতে যাওয়া সৈনিকদের মতোই বিদায় জানানো হল। ট্রেন সময়মতোই ছাড়ল। ও হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে স্যার হিসাবে গিয়েছিলেন ডঃ নীলাঞ্জন ভট্টাচার্য (SJB)ও স্যার ডঃ অশোক কুমার সরকার (AKS)। ট্রেন ছাড়ার খানিকপরেই স্যার আমাদের হাতে একটা পাখির বই আর বাইনোকুলার দিয়ে বললেন পাখি চেনার চেষ্টা করতে। ব্যাস হয় গেল আমার পাখির বিদ্যে, কাক-শালিক-চড়াই-পায়রার মধ্যে সীমাবদ্ধ, তাই খানিকক্ষণ পরে বন্ধুদের মুখে ড্রঙ্গো, পন্ড হেরন, লেসার, করঘোরন্ট এসবরে নাম শুনে আর এগুলোও যে পাখি তা জানতে পেরে বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। রাত্তিরে বাড়ি থেকে আনা খাবার খেয়ে যখন হাত ধুতে যাচ্ছি তখন দেখি আমার কিছু বন্ধু নিজেদের খাবার খেয়ে আবার অন্যদের থেকে ভাগ নিচ্ছে। কি করে পারে কে জানে? রাত্তির নটা সাড়ে নটার মধ্যে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু আমি ঘুমোলাম দুটো শিফ্‌টে ১১টা থেকে ১২ টা আর ১২টা ৩০ থেকে ৬-০০টা। SJB স্যার শোয়ার সাথে সাথেই ঘুমোলেন আর নাক দিয়ে কান বাজাতেও শুরু করলেন। সকালে উঠে পাখি একটা ব্যর্থ চেষ্টা করলাম। দুপুরে প্রথম ট্রেনের ময়দার লুচিটা চামড়ার লুচিতে কনভার্টেড নারকোল তেলের গন্ধ ছাড়া বিশেষ কোনো না। AKS স্যারের সাথে খানিকক্ষণ কথা বলার ধারে বসে চেন্নাই স্টেশন এর অপেক্ষা করতে সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ চেন্নাই পৌঁছল। চেন্নাইয়ে চট্‌চট্ গরমের জন্য অনেকেই ওখানে রিফ্রেশ এরপর আমরা স্টেশনেই রাত্তিরেই খাওয়া খেয়ে ফ্রায়েড রাসি আর রায়তা কোনটাই আমার না। রাত ১১টা নাগাদ ব্যাঙ্গালোর মেল-এ বেশ ভাল ট্রেন আর স্যার ও প্রশংসা করলেন। একটা জায়গায় খুব ঠান্ডা লাগা ছাড়া আর কিছু মনে নেই। পরদিন ৩০ তারিখ সকাল ব্যাঙ্গালোর সিটি স্টেশনে পৌঁছে এবং ওখানেই ও সুখ দিয়ে আমার রওনা দিলাম ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট সায়েন্স এর দিকে। ইতিমধ্যে একটা ঝামেলা হয়েছিল প্ল্যাটফর্মে আমার ব্যাগের তালার চাবি এমনভাবে গেল যে সেটাকে কাটা বা ভাঙ্গা ছাড়া কোন উপায় স্যার আশ্বাস দিল্যে আমি চিন্তায় রইলাম। ও হ্যাঁ একটা হোটেলে ব্রেকফাস্ট সারলাম। হোটেলটি সুন্দরভাবে গোছানো, লোকগুলোর ব্যবহারও খাবার দাবারের দাম ও কম দেখলে আই.আই.এসসি দেশের অন্যতম সেরা আর SJB স্যার ওখানকার প্রাক্তন ছাত্র ফুলে উঠল। ওখানে বিভিন্ন রিসার্চার এক সাথে তাদের রিসার্চ-এর বিষয় বস্তু দেখে শুনে, গাড়ীককার। এনাব লেখা বই আমরা পড়ি)-এর

বলে, সর্বোপরি আমাদেরই কলেজের আর একটা দিদি (অনিন্দতাদি) ওখানে রিসার্চ করছে শুনে বেশ ইম্প্রেসড্ হলাম।

লাঞ্চে ছোটো থালি বলে একটা থালি খেলাম যেটার সাথে দেওয়া বাটির সংখ্যা দেখে মনে হল কেউ যদি 'বড়া থালি' খেতে চায় তাহলে বোধহয় একটা টেবিলে একজনের বেশি খেতে পারবে না। যা হোক ব্যাঙ্গালোর সিটি স্টেশনে ফিরে এসে, প্ল্যাটফর্মে খেয়ে নিয়ে আমার রওনা দিলাম সিরসি যাওয়ার বাস ধরার জন্য। প্রসঙ্গত, সিরসি কর্ণাটকের একেবারে উত্তরে গোয়ার সীমান্তে অবস্থিত জেলা উত্তর কানাড়া-র অন্তর্গত একটা শহর আর এখান থেকেই আমাদের ফিল্ড ওয়ার্ক শুরু হবে। রাত নটা নাগাদ চার্টার্ড বাসে উঠলাম, চমৎকার বাস, আর রাস্তা দিয়ে চললও বেশ মসৃণ ভাবে তাই পেছনের দিকে বসা সত্ত্বে রাত্তিরে বেশ খানিকক্ষণ ঘুমোতে পারলাম। ৩১ তারিখে সকাল ৬টা নাগাদ সিরসিতে পৌঁছলাম।

সিরসিতে যে হোটেল উঠলাম সেটা আমার থাকা হোটেলগুলোর মধ্যে সেরা। আনন্দ করে শোব ভাবিছি ওমা, স্যার বললেন চান খাওয়া করে ১০টার মধ্যে বেরোতে হবে। যা হোক 'কাসায়া' নামে দুধের মতো একটা বেশ ভাল পানীয় খেয়ে রওনা দিলাম। বেশ খানিক ক্ষণ পরে (বোধহয় ১-৩০টা) গন্তব্য ম্যাগোট-এ পৌঁছলাম। দারুন সুন্দর ঝরণা জীবনে প্রথমবার টিভিতে না দেখে নিজের চোখে ঝরণা দেখছি। আর অনেক পাখি (যদিও আমার পাশির ভোকাবুলারি খুবই খারাপ) আমার মন ভরিয়ে দিল। ওখানে অনেক গাছ দেখলাম। দীপক শেট্টি বলে একজন ভদ্রলোক আমাদের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। এখানে বলে রাখি ভদ্রলোকের এন্যার্জি অফুরন্ত। পরে আমরা তার আরও ভাল প্রমাণ পেয়েছিলাম। সেদিন দুপুরে আমরা একটা কর্ণাটকী বাড়িতে খাওয়া সারলাম। উঁচু পিড়ি, জলের ঘটি, নতুন ধরনের নুন আর সেই সঙ্গে দারুণ খাবার। সাউথ ইন্ডিয়ার খাবার সংক্রান্ত দুর্নাম ঘোচানোর পক্ষে যথেষ্ট। ফেরার পথে একটা জঙ্গল মত জায়গায় নেমে আমরা কিছু পিঁপড়ে কালেক্ট করলাম। এরপর ৭-৩০ নাগাদ হোটেলে ফিরে এলাম। সবে গাটা এলিয়েছি, স্যার ঘরে এসে বললেন যে তাড়াতাড়ি নীচের হোটেল গিয়ে খাওয়া সেরে শুয়ে পড়তে কারণ আগামী কাল ৮টার মধ্যে বেরুতে হবে। আর নাকি পায়ের ওপর অনেক চাপ পড়বে। কারণ ১৫-২০ কিমি হাঁটতে হবে। অগত্যা একটা ছেলের ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লাম, কারণ আর্লি রাইজার হিসাবে আমার বা আমার রুমমেটদের খুব খ্যাতি নেই।

পরদিন ১লা ফেব্রুয়ারি সকালে উঠতে যথারীতি দেরী হল কারণ অ্যালার্ম ঘড়িটা কেউ রাত্তিরে বন্ধ করে দিয়েছে। যদিও কে ঘটনাটা ঘটিয়েছে তা এখনো নিশ্চিত নয়। ঐদিন বিস্তর চড়াই-উৎরাইয়ের পর একটা চোখ ধাঁধানো ফলসের দেখা পেলাম। নাম উন্‌চেল্লি। ফটাফট্ ফটো নিলাম। এটা অখ্যানশিনী (বাংলায় 'পাপনাশক') নদীর অংশ, ও হ্যাঁ, ওখানে জঙ্গলে খানিকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলাম। যদিও ছুঁচালো পাথরে জন্য পেছনে বেশ ব্যাথা লাগছিল কিন্তু তাও SJB স্যারের অমৃবাণীর ভয়ে কনসেনট্রেট করলাম। বেশ ভালও লাগল। এখান থেকে গণপতি ভাট বলে একজন ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলাম। সেখানেকার দলজা জানালা কাঠের কাজ, নকশা দেখে মাথা ঘুরে যাবার জোগাড় হল। হোটেলে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। প্রচুর প্ররিশ্রম হওয়া সত্ত্বেও নিজেকে আশ্বস্ত করলাম এই বলে যে এতে অন্তত আমার ওজন কিছুটা কমবে। পরদিন ২ তারিখ, অ্যালার্ম ঠিক সময়েই বেজেছিল কারণ রাতে অনেক প্রিকশন্ নেওয়া হয়েছিল। গন্তব্য ইয়ানা পৌঁছতে এত খাড়া চড়াই উৎরাই পেরুতে হল যে জিভ প্রায় বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড়। আগের দিন দুটোর মতন চোখ ধাঁধানো প্রাকৃতিক দৃশ্য না হলেও এখানে দুটো প্রকান্ড পাথর দেখলাম। বড়টার নাম ভৈরবাশ্বরী, মেজটার নাম মোহিনী। এখানে অনেকটা পথ আমাদের কয়েকজনকে খালি পায়ে ঝোপ, পাথরের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হল। কিন্তু দীপক কাকু এমন তিড়িং-বিড়িং করে অথচ নিঁখুত ভাবে খালি পায়ে দৌড়ে দৌড়ে চললেন, মনে হল তিনি বোধহয় রোজ এখানে খালি পায়ে হাঁটা প্র্যাকটিস করেন। এত করে নিচে নেমে যখন ভাবছি স্যার SJB আমাদের বাহবা দেবেন ওবাবা উল্টে জঙ্গলে নিজেদের মধ্যে জোরে কথা বলার জন্য তিনি এমন গালাগাল করলেন যে পুরো মজাটাই মাটি হয়ে গেল। পরদিন ৩ তারিখে রেস্ট ডে। সন্ধেবেলায় আমরা একটা মেলায় গেলাম। মিস্টি পাঁপড় আর লঙ্কার বড়া খেলাম। ৪ তারিখে ফিল্ড ওয়ার্কের আগামী গন্তব্য কুমটায় পৌঁছলাম। ২-৩০ ঘন্টা মতো লাগল। এখানে একে গরম তার ওপরে আমাদের ঘরের পাখাটা এমন আকর্ষণীয় স্পিডে ঘোরে যে গরম ডবল হয়ে যায়। ঘরগুলোও ছোটো দরজা খুলে ঘাটে উঠে পড়তে হয় আবার ঘাট থেকে নেমে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে যেতে হয় টাইপের আর কি। ওদিনকার কতা আর বিশেষ মনে নেই। ৫ তারিখ, কুমটা রেলওয়ে স্টেশনে পৌঁছলাম। SJB স্যার বললেন এটা ওনার দেখা সবচেয়ে সুন্দর স্টেশন। আমি ভাবলাম বলব যে শিয়ালদহ আর হাওড়া এর চেয়েও সুন্দর কিন্তু গালাগালের

ভয়ে বললাম না। গন্তব্য কারওয়ার (এটাও সিরসি কুমটার মতোই উত্তর কানাড়া জেলায় অবস্থিত)। এ ঘোরাঘুরির পর দেওবাগ বলে একটা বীচে গেলাম। এখানে জীবনে প্রথমবার আমি সমুদ্রের জলে পা দিলাম।

৬ তারিখ, সকালে আঘানাশিনী বলে একটা গ্রামে গেলাম। খোনে আম্মার বাড়ির অতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। প্রসঙ্গত SJB স্যার রিসার্চের কাজে যখন এখানে আসতেন তখন আম্মার বাড়িতেই থাকতেন। এখানে বেশ কিছু ফিল্ড ওয়ার্কের পর আম্মার হাতের রাঁধা কাঁকড়ার ঝোল খেলাম। প্রথমবার খাচ্ছি, তাই SJB স্যার গাইড করে দিলেন। মোটামুটি লাগল। এরপর আমরা কুমটাবীচে সূর্যাস্ত দেখলাম। অপূর্ব দৃশ্য। যেন একটা গোল সোনালি থালা প্রথমে আস্তে আস্তে তারপপ ফট করে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। আমিও চটপট সিকোয়েন্স ওয়াইজ চারটে ছবি তুলে ফেললাম। এর খানিকক্ষণ পরে চন্দ্রোদয় হল। আমাদের এক বন্ধু ফ্ল্যাশ দিয়ে সেটার ছবি তুলতে গিয়ে SJB স্যারের কাছে বিস্তর ঝাড় খেল।

পরদিন ৭ তারিখ সকাল থেকেই শুনলাম যে আজকে নদীতে চান করার একটা প্রোগ্রাম আছে। মুস্কিলে পড়লাম। কারণ বাড়ি থেকে শক্ত নির্দেশ জলে নাম নৈব নৈব চ। যা হোক আখানশিনী নদীর একটা শাখায় গেলাম। এখান সবাই আঘানশিনী। প্রসঙ্গত এটা ভারতের একমাত্র দূষণমুক্ত নদী)। আমাদের মধ্যে অনেকেই সাঁতার জানে না। তাই SJB স্যার এমন একটা জায়গা বাছলেন যে সেখানে খুব কষ্ট না করলে প্রাণসংশরে কোন ভয় নেই। এখানে SJB স্যার হাত-পা ছড়িয়ে জলে ভাসার টেকনিক শেখালেন। প্র্যাকটিস করতে গিয়ে নাকে কানে খানিক জল ঢুকল। কিন্তু তার চেয়েও ভয়ানক যেটা হল যে আমি জলে ভেসে গেলাম, শেষে সেই জলে ডুবেই মরতে হল ভেবে যখন কষ্ট পাচ্ছি তখন আমাদের এক বন্ধু আমাকে হাত ধরে তুলে দিল হাটু জল ছিলো অবশ্য, বেঁচে গেলাম। খুব সুন্দর সুন্দর অভিজ্ঞতা হল। এদিন রাত্তিরেই আমরা রওনা দিলাম ব্যাঙ্গালোর এর উদ্দেশ্যে। কিন্তু আমার গলা চোক্ করে যাওয়ায় কথার বদলে খালি আওয়াজ (তাও বিকৃত) বেরুনো শুরু হওয়ায় নিজের ওপরেই বেশ রাগ হল।

৮ তারিখ ব্যাঙ্গালোর শহরে ঘোরার পর কাবেরী এম্পোরিয়ামে গেলাম। দামের বহর দেখে খালি ধূপের প্যাকেট নেওয়া ছাড়া আর কিছু নেওয়ার সাহস এল না। এরপর আমরা একটা খুব ভালো হোটেলে দুপুরের রাজসিক লাঞ্চ সারলাম। অনিন্দিতাদি আর অরুণদা (অনিন্দিতাদির স্বামী) আমাদের সাথে যোগ দিল। লাঞ্চটা মোটামুটি ৩ ঘন্টা চলেছিল। এটা একটা রেকর্ড নাকি চিন্তা করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রোদ্দুর আর কানের পর্দা ফাটানো ইংলিশ গানের জন্য উঠলাম না। এরপর গেলাম আইসক্রীম খেতে। আমার দুরবস্থার জন্য SJB স্যার আমাকে একটা ভাল গরম খেতে দিলেন। রাত্তিরে SJB স্যার এমন একটা গরম খাওয়ালেন যে তাতে গলার বেশ উপকার হল। রাত্তির ব্যাঙ্গালোর মেলে উঠলাম এবং যথারীতি ৯ তারিখ চেন্নাই-এ পৌছলাম। চেন্নাই স্টেশনে অনেকগুলো ছাত্রের সঙ্গে আলাপ হল। ওদের সাথে কথা বলে লাগল। বোধহয় দুপুর নাগাদ করমন্ডল এক্সপ্রেসে এতদিন বাইরে কাটানোর পর ঘরে ফিরতে খুব লাগছিল। ফেরার পথে আর পাখি চেনার ব্যাপার তবে এটা ঠিক যে পাখি চেনার দৌলতে অন্তত বাইনোক্ অপারেট করতে শিখলাম। সেটাই বা কম কীসের। মানে ১০ তারিখ বেলা ১-৩০ নাগাদ করমন্ডল স্টেশনে পৌছল।

পুরো ট্যুরটা জুড়েই অনেক কিছু জানলাম, শিখ অনেক পাখি, প্রাণী, প্রজাপতি দেখে চিনতে শিখলাম। এছাড় বাইওে ওখানকার কালাচারের সাথে পরিচিত হলাম। অ নতুন খাবার খেলাম। সবগুলোই হয়তো সুস্বাদু নয় কিন্তু অনেকটাই দারুণ)। বিভিন্ন ধরনের লোকের সাথে হল। এর ফলে সাউথ ইন্ডিয়া সম্পর্কে অনেক বদ্ধমূল ধারণা পরিবর্তন হল। অনেক প্রাকৃতিক দৃশ্য হয়তো প্রথমবার বলে) সত্যি অবাক করে দেওয়ার মত। SJB স্যার সকলকেই ঝাড় দিলেও কেউ তাতে খুব একটা রাগ বলে আমার একবারও মনে হয় নি। কারণ রাত্তির তিনি আমাদের নানা গল্প শুনিয়ে (যদিও তার মধ্যে ঘটনা অবলম্বনে আর কটা স্বরচিত) তা নিয়ে সন্দেহ সকালের ঝাড়গুলোকে ব্যালান্স করে দিতেন। হয়তো কয়েকজন বন্ধু এমন কিছু ঘটনা ঘটিয়েছিল যা এক্সকারসন-এ কখনোই অভিপ্রেত নয়। তাই তাদেরকেই শাস্তি দিতে হয়েছিল। কিন্তু আমার ধারণা আমাদের ১৭ জনই সমানভাবে এই এক্সকারসনটাকে উপভো করেছিল। সর্বোপরি আমার মতো একজন ঘরকুনো মনেও যে আবার একবার ঘুরে আসার ইচ্ছা তৈরি হ তা আমার কাছে একটা বিশাল প্রাপ্তি। AKS স্যারের হয়তো বেশি লেখা হল না কিন্তু তিনিও যখন যেভাবে পেরেছেন যথোপযুক্ত সাহায্য করেছেন। লেখায় হয় অনেক অভিজ্ঞতাই বাদ পড়ে গেল কিন্তু এটাও ঠিক যে অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করা সম্ভবও নয় বা অনেক হয়তো উচিতও নয়।

বেলিয়াখালের ডোঙা

দেবারতি বসু
তৃতীয় বর্ষ, সম্মানিক উদ্ভিদবিদ্যা

সেই প্রথম ট্রেকারের মাথায় উঠেছিলাম। অনেকটা পথ। গাড়ি যে নৌকার মতো দুলে দুলে চলে সেই প্রথম টের পেলাম। অনেক কাল আগে স্যতজিৎ রায়ের লেখায় পড়েছিলাম তাঁর ছেলেবেলায় কলকাতার পথে ছাত খোলা দোতলা বাস চলতো। ট্রেকারের মাথায় উঠে আগে স্বাদ না পাওয়া এক অদ্ভুত অনুভূতি হল।

সেটা ছিল জামাই ষষ্ঠির দিন। ভোর ভোর শিয়ালদা থেকে ট্রেনে উঠেছিলাম। গাদাগাদি ভিড়। লোকেদের কথায় শুনেছিলাম একে বলে বনগাঁ লাইন। ট্রেন চলছিল ভিড় আরো বাড়ছিল। আমাদের চিঁড়ে চেপ্টা হবার জোগাড়।

প্রথম লোভটা দেখান এস জে বি স্যার। এস জি বি মানে শীলাঞ্জন ভট্টচার্য্য। আমাদের স্যার। উনি একটা এন জি ও -র সাথে যুক্ত। অনেক দূরে প্রত্যন্ত গ্রামে তাদের কাজ কারবার। ক্রমশ ক্রমশ নিঃস্ব হয়ে আসা জীব বৈচিত্র্য বাঁচাতে তাঁরা কাজ করছেন। একটা ছোট গ্রামের মানুষকে স্বনির্ভর করে তুলছেন। গ্রামের মানুষকে বুঝিয়েছেন গ্রাম বাঁচাও, গাছপালা, পশুপাখি, খাল-বিল, জলা জঙ্গল বাঁচাও এরাই তোমাদের বাঁচাবে। ক্লাসে এ রকম ভাষণ অনেক, অনেকের কাছেই শুনতাম। তাই সেই গ্রামটায় যাবার যখন একটা সুযোগ এসে গেল তখন আর ছাড়ে কে! এস জে বি স্যার তখন হ্যামলীনের বাঁশীওয়ালা। একবার যখন বাঁশীতে - ফুঁ দিয়েছেন, আমরা দল বেঁধে চলেছি। আমি, ধ্রুব, সৈকত, পাপড়ী, মৌসুমী, সুস্মিতা, অরিজিৎ, ময়ূখ - দুত্তোরি সব নাম মনেও পড়ছে না। মনে পড়লে পরে তাদের নাম বলে দেব। লোকগুলো মুখের সমানে এসে দাঁড়াচ্ছিল। আমার থেকে সৈকত, সৈকতের থেকে ধ্রুব, ধ্রুব থেকে অনির্বানদা, হ্যাঁ এই নামটা আগে বলা হয় নি। এই লোকগুলোর কারোর গায়ে নতুন ধুতি পাঞ্জাবী, পুরনো জামাকেই মেরামত করে আজ নতুন করা হয়েছে। খুব হাসা হাসি করে হচ্ছিল। হঠাৎ কে বলল — 'এসে গেছে'। কথা বলতে বলতেই গেটের দিকে সবাই এগোনোর চেষ্ঠা করছি। একই সঙ্গে আমরা আর আমাদের মালপত্র গেটে পৌঁছনো সম্ভব নয়। ট্রেনের নতুন জামাইদের একটু মায়া দয়া হলো। তারা আমাদের প্রায় ঠেলা দিয়ে গেটের বাইরে বোঝার মতো ছুঁড়ে দিল, আর মালপত্র জানালা দিয়ে গলিয়ে দিল।

যাক্ শেষ পর্যন্ত মালপত্র ও মালিক একসঙ্গে হতে পারলাম। কিন্তু একি এ কোথায় এলাম! এটা একটা ইস্টিশন হতে পারে। তবে স্টেশন নয়। ছাদ নেই প্লাটফর্ম আছে। টিকিট পরীক্ষক ত্রি-সীমানায় নেই। বাদুরিয়া ও বসিরহাটের মাঝামাঝি ইস্টিশনটা - নাম হয়তো মছলন্দপুর।

এই প্রথম গ্রামের গন্ধ পেলাম। স্টেশনে কিছু নেই কিন্তু অনেক গাছ আছে। একটা প্ল্যাট ফর্মে এত গাছ আগে কখনো দেখিনি, একটু হেঁটে রেল গেট। গেট ম্যান ছিল কি না মনে নেই। বন্ধ গেটের পাশ দিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে গেলাম। বাস আছে কিন্তু ঠাঁই নেই। গোটা বাসই জামাই - স্পেশাল হয়ে আছে। অগত্যা ট্রেকার। ট্রেকারে ওঠার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য জামাইবাবু জিন্দাবাদ। ট্রেকারের ছাদে, গায়ে মাঝে মাঝে পথের দুপাশের গাছপালা হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। আমাদের ঠিকানা আঁধারমাণিক। ভাল রাস্তা ছেড়ে এক সময় ট্রেকার আর একটু নড়বড়ে রাস্তায় নামলো। এখানে দুপাশের গাছপালা ছুঁতে পারছিলাম না। কিন্তু কাছে দূরে ধান ক্ষেত, পাট-ক্ষেত, দীঘি, বিল একটার পর একটা টপকে যাচ্ছিলাম। বিলের জলে পানকৌড়ি

মাঝে মাঝে গলা বাড়াচ্ছিল। ট্রেকারে সঙ্গী যাত্রীদের বাচ্চা সামলানোর অভিনব অভিজ্ঞতাও এই প্রথম। ট্রেকার থামল মন্টুর সাইকেল কারখানার কাছে গিয়ে। এখানেই দেখলাম প্রথম সেই শব্দটা 'আঁধারমাণিক'। মন্টুর সাইকেল কারখানাই আঁধারমাণিকের সিংহ দুয়ার। এখান থেকে আরও খানিকটা পথ হেঁটে 'স্বনির্ভর'। এন জি ও-র দেওয়া নাম।

আমাদের আর তর সইছিল না। তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে ছুটলাম গ্রাম দেখতে। আমরা তখনও জানি না আমাদের মতো আজব চিড়িয়া দেখতে গ্রামের মানুষও অপেক্ষা করছে। সবচেয়ে উৎসাহ ছোটদের মধ্যে। ওদের মধ্যে গোপন লড়াই শুরু হয়ে গেছে। কে আমাদের গাঁয়ের দ্রষ্টব্য জিনিস দেখাবে, মজার মজার জায়গায় নিয়ে যাবে। ওরা আমাদের শ্যাওড়া গাছ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ওদের চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। আমরাও দেখেছি। কিন্তু এখনো বলতে পারব না শ্যাওড়া গাছ দেখতে কেমন। একটা বড় গাছ তাকে জড়িয়ে আছে প্রচুর লতা পাতা, এর মধ্যে কোনটা শ্যাওড়া গাছ, তার পাতা ফল আলাদা করে চিনতে পারি নি। কিছু ফল যদিও মাটিতে পড়েছিল, তার থেকে অদ্ভুত এক বুনো গন্ধ আসছিল। সেই গন্ধের কোন নাম জানি না তাই বোঝাতে পারব না। সে শুধু আছে আমার অনুভূতিতে। টি.ভি. দেখে দেখে ক্যাটওয়াক আমরা অনেকেই রপ্ত করেছিলাম। আল পথ দিয়ে হাঁটা কতটা কঠিন তা বোঝার আগেই অনেকে চিৎপটাং। লজ্জার কিছু নেই, কেউ রেহাই পায়নি। দু একজন কায়দা করে যদিও বা তখন সামলে ছিল। বেলিয়াখালের ডোঙায় উঠতে গিয়ে জলকাদায় তাদের মাখামাখি অবস্থা। ডোঙা দেখে ভেবেছিলাম এ আর কি। টি.ভি. তো কত রোয়িং দেখেছি। টি.ভি তে ক্যানোইং দেখেছি। তাল গাছের গুঁড়ি, তার পিঠটা হাঁ হয়ে আছে। জলে পিঠ ঠেকা ঠেকি করে সে... গ্রামের ছেলে মেয়েরা তাতে করে মাছ ধরতে বেড়াচ্ছে। আর আমরা পারব না। উঠতে গেলেই উলটে যাচ্ছে।

অধীর সামন্তের কাছে মাছ ধরার গল্প —বেলিয়াখালে ডোঙায় চড়ে সে অনেক দূরে যায়। রাত-ভোর জাল ফেলে বসে থাকে। আঁধার আগেই জাল তুলে সন্ধান পায় মাণিকের।

আঁধারমাণিকের বাজারেই প্রথম পরিচয় মাছের সঙ্গে। একটা মাছের গায়ে এত রঙ! গ্রামে ভোরে পাখি দেখতে গিয়ে শালুক দেখেছিলাম। জলে ফুটন্ত শালুক দেখে মনে হল ইকেবানার থেকেও বেশী সুন্দর।

প্রথম দিনের সন্ধ্যায় অনেক পাখির শুনেছিলাম। কেউ দেখা দেয় নি। পাখিদের খোঁজে বেরিয়ে শিশির ভেজা গাছের পাতা, ফুটন্ত সকাল ডাক। হঠাৎ এক দুধরাজ আমাদের নাড়া দিয়ে গেল পাখি দেখতে দারুন। কিন্তু ছবির দুধরাজের থেকে বুকে দুধরাজ যে কত বেশী সুন্দর দেখতে তা বুঝলাম।

এই গ্রামের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা নিয়ে স্বনির্ভর বাহিনী গড়ে তুলেছে। তারা চাষের কাজ করেই পড়ার খরচ জোগাড় করে।

এবার তবে ফেরাও তরী। বুকটা কেমন দিয়ে উঠল। একটা রাত, স্বনির্ভরে, একটা দিন হকের বাড়িতে, অধীর সামন্তের ডোঙা, শালুক দুধরাজ এই কদিনেই এত আপন হয়ে যাবে, ভাবি আসতে মন চাই-ছিল না। আমরা ফিরে এলাম পথ চেয়ে।

সুরসিক বিবেকানন্দ

মন্দিরা কর
প্রথম বর্ষ, সাম্মানিক অঙ্ক

স্বামী বিবেকানন্দ নাম শুনলেই আমাদের মনে তাঁর প্রতি সম্ভ্রমমিশ্রিত শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি পাশ্চাত্যবাসীদের ভারত ও ভারতীয়গণের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মান, আস্থা ও বিশ্বাস জাগিয়েছিলেন। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বের কথা আমরা জানি, অপরদিকে তাঁর পূর্ণ রসিকতা বোধ, তাঁর বহুমুখী প্রতিভা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত। এখানে রসিক বিবেকানন্দ সম্বন্ধেই কিছু লিখছি, শুরু করছি ওঁনার ছেলেবেলা থেকে —

ছেলেবেলায় তাঁর ছোট ভাই বোনেরা রাত্রে শোবার সময় গল্পের বায়না করত, আর তিনি গল্প বলতেন। তার একটি —

এক বাগদী বুড়ির একটি ছাগল ছিল। একদিন এক দুষ্টু লোক সেটাকে চুরি করে খেয়ে ফেলে। বুড়ি ছাগল খুঁজে না পেয়ে সেই লোকটাকে জিজ্ঞেস করলে, সে তখন বুঝিয়ে দিলে যে ছাগলটা ছাগলজন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে মানবজন্ম লাভ করেছে আর কাজী হয়ে বিচার করছে। বুড়ি তাঁর ছাগল-দড়ি নিয়ে কাজীর এজলাসে হাজির হলো। ছাগলের যেমন দাড়ি ছিল, কাজীরও তেমন দাড়ি, ছাগলের রঙ কালো, কাজীরও তাই। আর বুড়ির ঠিক ধারণা হল — এ তাঁর ছাগল না হয়ে যায়না, তাঁর আদরের ছাগল এখন উদ্ধার হয়ে কাজী হয়েছে। তাই সে দড়ির ফাঁসটা কাজীর দিকে দেখিয়ে বললে, 'অ-র্-র্-র্, হিলি আয়, আয়'। কাজী এজলাস থেকে ব্যাপারটা দেখে চাপারাশীকে জিজ্ঞেস করলে, 'বুড়ি কি বলে?' চাপরাশী বুড়িকে জিজ্ঞেস করতে বুড়ির উত্তর, 'কেন, তোমার কাজী কি সব ভুলে গেছে? আজ না হয় কাজী হয়েছে, কিন্তু আমি যে এতদিন তাকে মাঠে চরালুম, ছোলা খাওয়ালুম, ও সব ভুলে গেল? মুখপোড়া একন বলে কিনা, বুড়ি কি বলে?' চাপারাশী মাথামুণ্ডু কিছু বুঝতে না পেরে কাজীকে বুড়ির কথা বললে, কাজী তখন বুড়িকে জিজ্ঞেস করতে বুড়ি দড়িটা দেখিয়ে বললে, 'অ-র্-র্, হিলি আয়, আয়। তোকে আর এদের বাড়ি থাকতে হবে না, নিজের বাড়ি চল্।' কাজী হতভম্ব, লোকজন হই-চই করে উঠল। বুড়ি অবাক, বললে, 'আরে বাবা, তুই আমার সেই ছাগল, এখন না হয় মানুষ হয়ে, কাজী হয়ে বিচার করতে বসেছিস। তা বেশ, আমি খুশী হয়েছি। তাই বলে এই বুড়িকে ভুলতে হয়?' কাজী ব্যাপারটা বুঝে, দোষীকে শাস্তি দিল।

স্বামী বিবেকানন্দের পিতা, বিশ্বনাথ দত্ত, তিনিও সুরসিক ছিলেন। মেট্রোপলিটান স্কুলে পড়াকালেই নরেনের ধূমপান অভ্যাসের সূচনা। ধর্মের প্রতি পুত্রের অকাল আসক্তির কথা পিতা জানেন, এখন আর একটি জানলেন। পড়ার ঘর বন্ধ করে পুত্র ধূমপান করে থাকেন, পিতা বললেন, 'বাবাজি ঠাকুরকে ধূপ-ধূনা দিচ্ছেন, তাই ঘর বন্ধ'।

বেহিসেবী পিতার সামনে দাঁড়িয়ে পুত্র নরেনের ক্ষোভ — 'অপনি আমাদের জন্য কি রেখে গেলেন?' পিতার উত্তর — 'কি দিয়ে গেলুম? যাও আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দ্যাখো।'

নরেনের দুষ্টুমি সকলকে অস্থির করে তুলত। মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী বলতেন — 'শিবের কাছে ছেলে চেয়েছিলুম, তিনি পাঠালেন ভূত!' নরেন প্রায়ই সীমা লঙ্ঘন করে এমন সব বাক্য জননীকে শোনাতেন, যা মোটেই শ্রুতিসুখকর নয়। কথাগুলি পিতার কানেও গিয়েছিল। তিনি

কিছু করলেন না — ঐ কথাগুলি নরেনের ঘরের সামনে লিখে রাখলেন, যাতে পুত্রবন্ধুগণের দৃষ্টিগোচর হয়। শিরোনামা ছিল —'শ্রীমান নরেন্দ্রনাথ অদ্যৎ এই সকল বাক্যে তাঁহার গর্ভধারিণীকে সম্মানিত করেছেন।'

স্বামী বিবেকানন্দের গুরু, শ্রীরামকৃষ্ণ তিনিও কম রসিক ছিলেননা। তিনি নরেনের গান শুনতে খুব ভালোবাসতেন। নরেন গান গাইবেন তাই অনেক্ষণ ধরে তানপুরা বাঁধছেন, তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ অধৈর্য্য হয়ে পড়েছেন। বিনোদ কৌতুক করে বলেছেন — 'বাঁধা আজ হবে, গান আরেকদিন হবে।' তিনি হেসে বললেন — 'এমন ইচ্ছা হচ্ছে, তানপুরাটা ভেঙে ফেলি। কি টং টং! আবার তানা নানা নেরে নুম্ হবে।' ভবনাথ বললেন — 'যাত্রার গোড়ায় অমন বিরক্তি হয়।' নরেন্দ্র তানপুরা বাঁধতে বাঁধতে উত্তর দিলেন — 'সে না বুঝলেই হয়।' তাতে শ্রীরামকৃষ্ণ খুশী হয়ে বললেন —'ঐ! আমাদের সব উড়িয়ে দিলে!!!'

শ্রীরামকৃষ্ণকে মুখের ওপর মূর্খ বলেন নরেন্দ্রনাথ। বড় আনন্দে আত্মপক্ষ সমর্থন করে ঠাকুর বলেছেন —"লরেন আমায় যত মুক্খু বলে, আমি তত মুক্খু লই।" তারপর বাঁহাতের চেটোয় ডান আঙুল দিয়ে লেখবার ভাঙ্গি করে দাবী জানালেন —'আমি অক্ষর জানি।'

তারপর, স্বামীজী শিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিলেন এবং ভারতের নাম জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করলেন। তবুও স্বামীজীকে সেখানে নানা অদ্ভুত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হতো এবং স্বামীজীও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ফিরিয়ে দিয়েছেন। যেমন —

প্রশ্ন ঃ- 'একথা কি সত্য, আপনারা সদ্যোজাত শিশুকে গঙ্গায় ফেলে দেন?

স্বামীজী ঃ- মহাশয়া, আমি শুনেছি, থ্যাঙ্কস-গিভিং -এ আপনারা নবজাত শিশু পরিবেশন করেন — সেকথা কি সত্য?

প্রশ্ন ঃ- একথা কি সত্য, আপনারা সদ্যোজাত শিশুকে গঙ্গায় ফেলে দেন?

স্বামীজী ঃ- হ্যাঁ মহাশয়া। তবে আমি বেঁচে ফিরেছি।

আতঙ্কিত মহিলার প্রশ্ন — 'কি ভয়ঙ্কর! আপনাদের দেশে নাকি মেয়ে জন্মালেই তাকে কুমীরের মুখে ফেলে দেওয়া হয়?

স্বামীজী ঃ- নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। সেই জন্যই তো এখন ভার প্রসবাদি-কর্ম পুরুষদেরই করতে হচ্ছে।

পরাধীন ভারতে স্বামীজীকে নানা প্রতি অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল, সেরকম একটি, যখন পরিব্রাজক অবস্থায় ছিলেন। স্বামীজী রেলগাড়ীতে উঠে একবার, তখন সেই কামরায় দুটি ইংরেজ উপস্থিত। গেরুয়াবসনধারী স্বামীজীকে দেখে সাধারণ সাধু ম করেছিল। নিজেদের মধ্যে তারা ইংরিজিতে স্বামীজী নিয়ে হাসাহাসি করছিল।

প্রথম ইংরেজ ঃ- 'See, Here comes an ass!'
(দেখো, একটা গাধা আসছে!)

দ্বিতীয় ইংরেজ ঃ- 'No, no; its a dog!'
(না, না; এটা একটি কুকুর)

স্বামীজী ঃ- 'And, I'm sitting between the two!'
(আর আমি সেদুটির মাঝখানে বসে আছি)

এই কথা শুনে সেই ইংরেজ দুটি লজ্জা পেয়ে যায় যে, স্বামীজী তাদের ভাষা ভালমতোই জানেন এবং সদুত্তরও দিতে পারেন।

সাহিত্যিক সতীনাথ ভাদুড়ী (১৯০৬-১৯৬৫)

সিদ্ধার্থ গুহরায়, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ

১৯৮০ দশক থেকে ভারতের নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চা বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে রণজিৎ গুহ সম্পাদিত Subalter Studies -এর খন্ডগুলি অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে গুজবের ভূমিকা কি ছিল - তাও ঐতিহাসিক আলোচনার উপজীব্য হয়ে দাড়িয়েছে। রণজিৎ গুহ লিখেছেন - "যে কোন প্রাক শিল্পায়ন, প্রাক শিক্ষিত সমাজে কোন অভ্যুত্থানের সার্বিক ও প্রয়োজনীয় বাহন হিসাবে কাজ করে গুজব। মুলতঃ অশিক্ষিত মানুষে পরিপূর্ণ কোন দেশের বিস্তির্ন এলাকায় নিম্নবর্গের আন্দোলন গুজব ছাড়া সংগঠিত হতে পারে না। " স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগে গান্ধীজির ভাবমূর্তি (Charisma) বা তার ক্ষমতা সংক্রান্ত অতিকথা (Myth) নিয়েও ঐতিহাসিক গবেষণা সাম্প্রতিক অতীতে কম হয়নি। ১৯২১ সালের গোড়ার দিকে অসহযোগ আন্দোলনের সময় গান্ধীজি যখন যুক্ত প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলায় এসে উপস্থিত হন, তখন ১৩ই ফেব্রুয়ারীর 'স্বদেশ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল "Gandhi in dream : English-men runaway naked" অর্থাৎ গান্ধীজি স্বপ্ন দেখছেন ইংরেজরা নগ্ন অবস্থায় পালাচ্ছে। এই বক্তব্যের একটা প্রেক্ষাপট ছিল। ১৯২১ সালের ৩০শে জানুয়ারীর রাতে গোরক্ষপুরের কাছে কাসগঞ্জ রেল স্টেশনে এক ফিরিঙ্গি রেল ড্রাইভার খবরের কাগজ পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়েন। রাত্রি ১১টা নাগাদ এক দুঃস্বপ্ন তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ তিনি ইংরেজ রেল অফিসারদের বাংলোর কাছে গিয়ে চেঁচাতে থাকেন - "দৌড়ও, দৌড়ও। গান্ধী বহুসংখ্যক শক্তিমান ভারতীয়কে নেতৃত্ব দিয়ে এগিয়ে আসছেন আর ইংরেজদের ধ্বংস করে চলেছেন।"(Man, run, man ! Gandhi is marching at the head of several strong, Indians decimating the English). তৎক্ষনাৎ ইংরেজদের এক " বিষম ভীতি" (Great fear) গ্রাস করেছিল এবং অনেকেই বাংলো ত্যাগ করে পালিয়েছিল। পরের দিন ভারতীয়রা ঘটনাটা নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিল বটে, কিন্তু তাদের আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। এ সমস্ত গল্প ভারতীয়দের উপর অসামান্য প্রভাব ফেলেছিল। এই সব গুজব গান্ধীজিকে ঘিরে এক রহস্যময় কল্পকথার জন্ম দিয়েছিল। এলাহাবাদ গোয়েন্দা দপ্তরের গোপন প্রতিবেদনে (মে, ১৯২১) বলা হয় - কৃষকরা গান্ধী সম্পর্কে অস্পষ্ট গুজবগুলোকে একটি র‍্যাডিকাল জমিদার বিরোধী বাতাবরণ তৈরীর কাজে ব্যবহার করেছিলেন। এবং যুক্ত প্রদেশ ও বিহারে এই প্রবণতা তীব্র রূপ নিয়েছিল। সুমিত সরকার দেখিয়েছেন - বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের সময় এরকম ধারণা অনেকের মধ্যেই ছিল যে গান্ধীজিকে ইংরেজরা গুলি করা সত্যেও তিনি বারংবার সশরীরে আবির্ভূত হন। তারপর তাকে জেলে পাঠানো হলে জেলের তালা খুলে যায় এবং তিনি বেরিয়ে আসেন। কলকাতার মিল শ্রমিকদের মধ্যে এরকম একটা গল্প চালু ছিল যে ব্রিটিশ সৈন্যরা গান্ধীর দিকে বোমা ছোড়ার সঙ্গে সঙ্গে বোমাটি তার গায়ে লাগা মাত্র বরফের মত গলে যায়।

কিভাবে গান্ধীজির Charisma উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল এবং তাঁর অতিমানবিক গুণাবলী সংক্রান্ত গুজব কেন ছড়িয়ে পরেছিল - যে কথা আলোচনা করার ইচ্ছা অন্ততঃ এই প্রবন্ধে আমার নেই। আর তা ছাড়া এ বিষয়ে গবেষণা হয়েছেও বিস্তর। সেই সব গবেষণা থেকেই উপরোক্ত তথ্যগুলি আমরা সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এই সমস্ত

ঐতিহাসিক গবেষণার চার বছর আগে গান্ধী সংক্রান্ত গুজব ও অতিকথা নিয়ে লেখা হয়েছিল এক অসামান্য বাংলা উপন্যাস -''ঢোঁড়াই চরিতমানস''। লেখক সতিনাথ ভাদুড়ী। বাংলা সাহিত্যের অসম্ভব শক্তিমান এই লেখককে নিয়ে কয়েকটা কথা বলাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

পুর্ণিয়ার ছোট্ট গ্রাম তাৎমাটুলির মানুষদের অর্থাৎ তাৎমা (তাঁতি) দের প্রাত্যহিক জীবনের এক চমৎকার আলেখ্য ঢোঁড়াই চরিতমানস। ভারতবর্ষের সম্ভবতঃ সবচেয়ে জনপ্রিয় বই 'রামচরিতমানস' কে মাথায় রেখে লেখা এই উপন্যাস। নিম্নবর্গের মানুষ উপন্যাসের পাতায় এতখানি জীবন্ত হয়ে উঠেছে - এরকম দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে, তবে খুব বেশি পাওয়া যাবে না। তাৎমাটুলির এক সরল গ্রাম্য মানুষ ঢোঁড়াইকে ঘিরে গড়ে উঠেছে উপনিবেশিক ভারবর্ষের এক নাম না জানা এলাকা তৎমাটুলির অসামান্য ইতিবৃত্ত। অসহোযোগের সময় গান্ধী সংক্রান্ত অতিকথা বা Myth কিভাবে তাৎমাটুলিতে পৌছল তার বিবরণ সতীনাথ দিয়েছেন মুন্সিয়ানার সঙ্গে, সাবালটার্ন ঐতিহাসিকদের বহু আগে। সরকারী চাকুরে বাবুলালের তাৎমাটুলিতে ভারি খাতির, 'কলস্টর' (কালেক্টর) ও 'চেরমেন' (চেয়ারম্যান) সাহেবের চিঠি দেওয়া নেওয়া করে সে। শহর থেকে এসে সে গ্রামের মানুষদের কাছে মাস্টার সাহেবের চাকরী যাওয়ার উপাখ্যান শোনায়। কারণ জানার জন্য, সকলে উৎসুক হয়ে ওঠে। বাবুলাল বলে মাস্টার সাব গানহী বাবার চেলা হয়েছে। গানহী-বাবা কে ? বাবুলাল উত্তর দেয় - ''বড়া গুনহী আদমী। বৌকা বাওয়া আর রেবন গুনীর চাইতেও নামী। সিরিদায় বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে? গানহী বাওয়া মাস-মছলি নেশা ভাঙ থেকে পরাহস। সাদি বিয়া করে নি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।'' গানহী বাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটল সাংঘাতিক এক ঘটনা। একদিন সকালে গ্রামের সকলে রবিয়ার বাগানে ফলে থাকা কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার 'সুরত' (মূর্তি) দেখতে পেল। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। তারপর থানে পান সুপুরি গুড় দিয়ে কুমড়োটার পূজো হল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর প্রথম উপন্যাস 'জা...
প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলা সাহি...
এক বরণীয় লেখক। রসিক সমাজকে আলড়িত করে...
'জাগরী'। তবে সতীনাথ স্বয়ং মনে করতেন 'ঢোঁ...
চরিতমানস' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। তুলসীদাসী রামায়নের ...
বিহারের 'অন্তজ' তাৎমা ধাঙরদের যে ভাবে সাহিত্যে ...
দিয়েছেন সতীনীথ ভাদুড়ী - তা এককথায় অনবদ্য। ...
মুজতবা আলির মত লেখক এই উপন্যাস পড়ে অভি...
হয়ে মন্তব্য করে ছিলেন - তিনি এ রকম ঠাসবুনোটের ...
বিদেশী ভাষাতেও পড়েছেন অল্প।

১৯৪২ -এর ভারতছাড় আন্দোলনের প্রেক্ষা...
লেখা উপন্যাস 'জাগরী' জনযুদ্ধ বা People's War...
যোগান সামনে রেখে ভারতছাড়আন্দোলন থেকে নিজে...
সরিয়ে রেখেছেন তৎকালীন কমিউনিস্ট পার্টি। কমিউ...
পার্টির সেই ভূমিকা নিয়ে ঐতিহাসিক গবেষণা হ...
বিস্তর। ডান-বাম বহু ঐতিহাসিকই রায় দিয়েছেন ...
ভারতছাড় আন্দোলন থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে ...
অনেকটাই জনপ্রিয়তা খুইয়েছিলেন ভারতীয় কমিউনি...
কমিউনিস্ট পার্টির সেই ভ্রান্ত নীতির মূর্ত প্রতীক হয়ে...
'জাগরী' উপন্যাসের নীলু চরিত্র। আর এক আশ্চর্য ...
এই 'জাগরী'। বড় ভাই বিলু সমাজবাদী কংগ্রেস ...
ভাই নিলু কমিউনিস্ট। আর তাদের বাবা গান্ধীবাদী ...
এই তিন রাজনৈতিক টানাপোড়েনে অস্থির বিলু ও নী...
মা। ভারত ছাড় আন্দোলনে যোগদানের জন্য, বিলু ...
আসামী। আমি অন্ততঃ সামান্য যতটুকু পড়াশোনা ক...
আমার মনে হয় 'জাগরী'-এর মত যথার্থ অর্থে রাজনৈ...
উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বিরল। নীলু চরিত্র ...
কমিউনিস্টদের প্রতি সতীনাথের দৃষ্টিভঙ্গী গোপন থা...
বড় ভাই বিলু নীলু সম্পর্কে লিখছে - ''একবার ...
বলিয়াছিল তাহার কবিতা ভাল লাগে না। ...
বলিয়াছিলাম যে, এমন কবিতা লিখিয়া দিব যে তাহা...
নিশ্চয়ই ভাল লাগিবে। লিখিয়া দিয়াছিলাম বলির ...
প্রভৃতি দেওয়া একটি লাঠিমারা গোছের সনেট। নীলু...
ভাল লাগিয়াছিল।'' নীলু সম্পর্কে তাহার বাবার ...
''নিজের মত ধ্রুব সত্য বলিয়া মনে করিয়া, তাহা ...

সহিত ব্যক্ত করিতেই সে ব্যস্ত।'' মার্ক্সবাদে আস্থাশীল কোন স্থিতধী ব্যক্তি 'জাগরী' পড়লে ব্যথিত হন, কিন্তু তা অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

গ্রামীণ নিম্নবর্গের মানুষ স্থান পেয়েছিল 'ঢোঁড়াই চরিতমানস'-এ। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে লেখা 'জাগরী'। আর শিল্প শ্রমিকদের নিয়ে সতীনাথ লিখেছিলেন অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিচিত অথচ অসাধারণ একটি উপন্যাস 'চিত্রগুপ্তের ফাইল'। ঘটনার দিনক্ষণ - ১৯৪৮ এর ৩১শে জানুয়ারী। গান্ধীজির হত্যাকান্ডের ঠিক পরের দিন। বলীরামপুর জুটমিলের শ্রমিক নেতা ও সৎ রাজনৈতিক কর্মী অভিমন্যুর মৃত্যু হয়েছে। জুট মিলের ইংরেজ ম্যানেজার থেকে শ্রমিকের দল - সকলেই অভিমন্যুর চিতার পাশে দাড়িয়ে শোকে মুহ্যমান। তারপর এক পক্ষকাল কেটে গেল। হঠাৎ মিনাকুমারীর চোখ পড়ল একটা কাগজের মোড়কের ওপর। ২রা ফেব্রুয়ারীর খবরের কাগজ। তাতে রয়েছে বলীরামপুরের খবর। উৎসাহিত হয়ে ওঠে মিনাকুমারী। কাগজে লেখা আছে, ''মহাৎমাজীর মৃত্যু সংবাদ শোনামাত্রস্থানীয় রাজনৈতিক কর্মী অভিমন্যু সিংহের হৃদযন্ত্র ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায় এবং তিনি তৎক্ষণাৎ ইহলোক ত্যাগ করেন। অতি সমারোহের সহিত তাহার দেহ কর্তৃপক্ষ শ্মশানে লইয়া যাওয়া হয়। স্থানীয় মিল কর্তৃপক্ষ এবং প্রত্যেক মজুর গভীর শোকসন্তপ্ত চিত্তে শবানুগমন করিয়াছিল।'' অথচ পাঠকের কাছে অজানা থাকে না শ্রমিক নেতা ও সৎ রাজনৈতিক কর্মী অভিমন্যুর মৃত্যুর আসল কারণ।

ছোটগল্প রচনাতেও সতীনাথ সমান সাবলীল। ছোটগল্পের কথা বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 'গণনায়ক'। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি লেখেন এই গল্পটি। স্বাধীনতার পর দেশশাসনে সরকারী অব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র, প্রবীণ রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহ লাভের নির্লজ্জ প্রয়াস, তাদের লালসা স্বার্থপরতা এ সবকিছুরই স্বরূপ উৎঘাটিত হয়েছে তাঁর 'গণনায়ক' এবং অন্য অনেক ছোটগল্পে। এমনকি রানীতিবিদ - অসৎ ব্যাবসায়ীর জোটবন্ধন বা তৃমিকা - কায়স্ত - হরিজন - সমস্যা ইত্যাদিও তাঁর নজর এড়াতে পারেনি। 'আন্টা-বাংলা' তাঁর আর এক অনবদ্য ছোটগল্প। বরেন বসুর 'রিক্রুট' যেমন 'রঙরুট'-এ পরিণত হয়েছিল, তেমনই প্ল্যান্টার্স ক্লাব লোকমুখে 'আন্টা-বাংলা' য় পরিণত হয়েছিল। সাহেবরা বলত 'খ্লাব' পুর্ণিয়ার নীলকর সাহেবদের ঔদ্ধত্ব ও ব্যভিচার 'নীলদর্পণ' নাটকের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই গল্পের লেখক সতীনাথ প্রথম জীবনের গান্ধীবাদী নন বা পরবর্তীকালের সমাজতান্ত্রিক নন। এখানে তিনি একজন Humanist, pure and simple ; নিখাদ মানবতাবাদী।

সতীনাথের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার রসবোধ। 'ঢোঁড়াই চরিতমানস' উপন্যাসের শুরুতেই আমরা চমৎকার রসবোধের পরিচয় পাই। বিরাটবপু রায় সাহেব বক্তৃতা দিতে গিয়ে জিরানিয়াকে বলে ফেলেন ' গন্ডগ্রাম'। আঁতে ঘা লেগেছিল জিরানিয়ার ছেলের দলের। তারা তৎক্ষণাৎ রায় সাহেবকে পন্ডশ্রম না করে বসে পড়তে বলে। তাঁর ব্যাঙ্গাত্মক ছোট গল্পগুলো এক কথায় অনবদ্য। সাধু পুরুষের দেবত্বপ্রাপ্তি, সাধারণ মানুষের ধর্মীয়অনুভূতি আর তার সঙ্গে ভোটের রাজনীতির সমীকরণ নিয়ে এক অসামান্য সৃষ্টি 'চরনদাস এম.এল.এ.'। মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর কপটতা আর শিক্ষিত বাঙালীর ভন্ডামি নিয়ে তীব্র শ্লেষাত্মক রচনা 'মুনাফাঠাকুরন'। সতীনাথের রসবোধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরন ''ষড়যন্ত্র মামলার রায়''। রেবতী সেনের ম্যালেরিয়ার মশা ধ্বংসকারী ওষুধের ক্যানভাস শুনতে গিয়ে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়িয়ে পড়ে তড়িৎ মুখার্জি ওরফে ঘ্যান্টা ও মেহবুব নামে দুই তরুন। সতীনাথ আইন পড়েছিলেন। কিছুদিনের জন্যে তিনি আইন ব্যাবসার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ছিলেন। আইন জানতেন বলেই এই গল্পটা লেখার ক্ষেত্রে এতখানি নিপুন তিনি হতে পেরেছিলেন। আজকের আমরা নাগরিক অধিকার বা Civil Rights নিয়ে অনেকটা সচেতন হয়েছি। কিন্তু ''ষড়যন্ত্র মামলার রায়'' গল্পে প্রচ্ছন্ন ভাবে হলেও সতীনাথ বুঝিয়ে দিয়েছেন শাসনতন্ত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের সামনে নাগরিক অধিকার কখনই অলঙ্ঘনীয় নয়। তেমনই বলা যায় - যারা গণবিজ্ঞান আন্দোলন করেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সভাসমিতিতে ভাষণ দেন, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলছি, তাদের মধ্যে কতজন 'রসিক পালিয়া' গল্পটি পড়েছেন, আমার সন্দেহ আছে।

সতীনাথের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে। অভিযোগকারীরা অবশ্যই একদল সাহিত্য সমালোচক। অভিযোগটি হল - সতীনাথের সাহিত্যচর্চা আঞ্চলিক। বারবার তাঁর লেখায় উঠে আসে পুর্ণিয়ার মাটি, পুর্ণিয়ার মানুষ। সাহিত্য সমালোচকের পান্ডিত্য আমার নেই। আমি ইতিহাসের একজন সাধারণ ছাত্র। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলতে পারি - যদি সতীনাথের সাহিত্যচর্চা আঞ্চলিক হয়েও থাকে তাতে তাঁর সাহিত্যকীর্তি এতটুকু মলিন হয় না। বরং থেকে যায় আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার এক জীবন্ত দলিল।

একথা অনস্বীকার্য যে ইতিহাসচর্চার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান সাহিত্য। সাহিত্যের সাহায্য নিয়ে ইতিহাস রচনা করেছেন এরকম ঐতিহাসিকের সংখ্যা প্রচুর। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভর্তৃহরির কবিতার সাহায্য নিয়ে প্রাচীন ভারতের সাধারণ মানুষের অবস্থার একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা করেছেন ঐতিহাসিক দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বি। ষোড়শ শতকীয় ইংল্যান্ডে এনক্লোজার ব্যাবস্থাকে কেন্দ্র করে যে ভবঘুরের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, তাদের শেক্সপিয়রের নাটকে খুঁজতে প্রয়াসী হয়েছেন ঐতিহাসিক এলটন। সপ্তদশ শতকের ইংরেজ বিপ্লবের ইতিহাস তৈরী করতে গিয়ে মিলটনের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল হয়ে পড়েন খৃষ্টফার হিল। ফরাসী বিপ্লবের মহা ভাষ্যকার জর্জ লেফেভার বিপ্লবী সরকার ও রাজনীতির টানাপোড়েন বোঝার জন্য নাইনটি-থ্রি উপন্যাসের উপর নির্ভর করেন। ভিক্টরিয় ইংল্যান্ডের শহুরে দরিদ্র জনতার পান চার্লস ডিকেন্সের উপন্যাসগুলিতে। যায় - কোন মহান ঐতিহাসিক যদি কোনদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় হাত অবশ্যই নির্ভর করতে হবে, সতিনাথের উপর।[৫] যে কারণেই ইতিহাসের কষ্টিপাথরে অবশ্যই একজন কালোত্তীর্ণ সাহিত্যিক।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

1. Ranjit Guha, 'The Prose of Counter Insur in Subaltern Studies, Vol.I.

2. বিষম ভীতি বা Great fear. কথাটা ব্যাবহার গুজবের ওপর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইতিহাস সংক্রান্ত ভাবে সম্পত্তিশালী শ্রেণীকে সন্ত্রস্ত করেছিল, সেই বইয়ের আলোচ্য বিষয়।

3. Shahid Amin, 'Gandhi as Mahatma' in Sub Studies, Vol.III.

4. Sumit Sarkar, 'The Logic of Gandhian Na ism' Indian Historical Review, July 1976.

5. অমলেশ ত্রিপাঠী অবশ্য স্বাধীনতা সংগ্রামে ভ জাতীয় কংগ্রেস গ্রন্থে সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ক করেছেন।

অরক্ষণীয় ও কিছু উড়োভাবনা

শুভাশিস ভট্টাচার্য, অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ

শরৎ চন্দ্রের কথা সাহিত্যের এক চিন্তার দিক উপন্যাস ও বড় গল্পগুলির প্রকাশকাল। প্রায়শই পরপর একটি অপেক্ষাকৃত গভীর সমাজ সমস্যা কেন্দ্রিক উপন্যাস এবং ঘরোয়া পরিবেশের কাহিনী হয় একই বছরে প্রকাশিত, নয় পরের বছরেই প্রকাশিত। 'অরক্ষণীয়া'র প্রকাশ ১৯১৬ সালে। একই বছরে প্রকাশিত 'পল্লীসমাজ'। এরপর ১৯১৭ থেকে ১৯৩৩ অবধি আবার গুরুগম্ভীর সমাজ সমালোচনা মূলক উপন্যাসগুলি প্রকাশ পায়, অবশ্যই এক্ষেত্রে 'নিষ্কৃতি'র (১৯১৭) মত দীর্ঘ গল্প একটা ব্যতিক্রম। প্রশ্ন জাগে এই যে মুখ্য ও গৌণরচনার পরপর হাঁটা — এটা কি কাকতালীয়, নাকি, শরৎচন্দ্রের মানস রোমান্টিকধর্মী। শরৎচন্দ্রের লেখায় প্রায়ই দুটি সত্তার সহাবস্থান — অত্যন্ত দায়বদ্ধ এক শিল্পী আর মানুষ দেখতে যেমন লাগে তার চেয়ে সে অনেক বড় এমন একটা বিশ্বাস। এখানে শরৎচন্দ্রের স্বপ্ন সঞ্চরণ, এটাই তাঁর রোমান্টিক সত্তা। তাই যদি হয় তবে এ জাতীয় অপর লেখকের মত তাঁর কাছে সৃজন ক্ষমতা একটা জীবন শক্তি। এই শক্তির জোয়ার যেমন আসে, তেমনিই জৈবিক নিয়মে আসে অবসাদ। তাই কি মুখ্য ও গৌণ রচনার এমন ক্রমিক প্রকাশ? গৌণ রচনায় কি তাঁর ক্লান্ত কল্পনার সাময়িক বিশ্রাম আর তারপর আরও জোরে চলা? যাইহোক, এ ধরণের আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত হল অরক্ষণীয়া তাঁর একটি গৌণ রচনা।

গৌণ রচনা হলেও এ কাহিনীতে অতুল চরিত্র আমার কাছে বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চিরাচরিতভাবে শিরোনামে জ্ঞানদা – তার অভিমান, অনিশ্চয়তা, কষ্ট-যন্ত্রণার কথা প্রকট। আবার সে সময়, এমন কি আমাদের সময়ে, জ্ঞানদার মত সহায় সম্বলহীনার কথা মনে রাখলে অতুল দূরে সরে গিয়ে শুধু একটা ছবি চোখে ভাসে — এক কুরূপা অনূঢ়া মেয়ে ভাগ্য বিড়ম্বনার পর অত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। তার পেছনে শ্মশান আর সামনে অতল জলের সীমাহীন ঔদাসীন্য। তবুও অতুল একটা বিশিষ্ট চরিত্র। সময় সময় সে যেন খল চরিত্রের কাছাকাছি, তবুও শেষে তার এক বিরাট পরিবর্তন। এরকম প্রায় বিরোধী গতির আবর্ত অতুলের ভাবান্তরকে অবিশ্বাস্য করে তোলে। কিন্তু আমার মনে হয় অতুল চরিত্র একটা বিভ্রান্ত মানসিকতার সুন্দর প্রকাশ, তাই তাকে পাঠকের বিভ্রান্তির শিকার হতে হয় প্রায়শই।

এ ব্যাপারটা আলোচনার আগে অতুলকে একটু বুঝে নেওয়া যাক। কেমন মনে হয় অরক্ষণীয়া (১৯১৬) এবং দেবদাস (১৯১৭) যেন প্রায় একই কাহিনীর একটু ওলট-পালট। শরৎসাহিত্যে প্রেম প্রায়ই পরিণত মানব-মানবীর সম্পত্তি এবং তা প্রায়ই বিবাহ বর্হিভূত প্রেম। অতুল-জ্ঞানদা এবং দেবদাস-পার্বতী এর ব্যতিক্রম। অরক্ষণীয়া গল্পে প্রেম অনেকটা অস্ফুট দেবদাসের তুলনায়। কিন্তু লক্ষ্যণীয় অতুল এখানে সক্রিয় যখন নাকি পার্বতী এক ব্যতিক্রমী মেয়ে। জ্ঞানদা অনেক নিষ্ক্রিয় ও নীরব, খানিকটা সেই 'বুকফাটে কিন্তু মুখ ফোটেনা'। অতুলের অবস্থান দেবদাসের মত নয়, সে স্বচ্ছল কিন্তু জমিদার নয়। সহজেই অনুমেয় জ্ঞানদার আর্থিক অবস্থান পার্বতীর চেয়ে আরও করুণ। অতুল ও দেবদাস দুজনেই বৃহত্তর, সংস্কৃত কলকাতার শিক্ষিত পরিবেশকে জানে শোনে। অতুলের ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক। আর একটা দিক হল গ্রাম্য জীবনের বাইরে চলে যাওয়ার একটা বাসনা তার চরিত্রে বোধ হয় উঁকি দেয়। এই আবর্তের বাইরে যাওয়ার

ঝোঁক তাকে অশালীন সংকীর্ণতার ওপরে তোলে মাঝে মাঝেই।

কাহিনীর শুরুতেই আমরা জানি - বি.এ. এগজামিন দিয়া অতুল মাস দুই পূর্বে মাকে লইয়া তীর্থ-পর্যটনে বাহির হইয়াছিল। সম্প্রতি রামেশ্বর হইয়া, পুরী হইয়া কাল ঘরে ফিরিয়াছে'। এই তীর্থ যাত্রায় মায়ের নাম করে সে নিজের পয়সায় সুদৃশ্য চুড়ি জ্ঞানদাকে মনে করেই কিনেছে। কিন্তু দুর্গামণির কথায় জ্ঞানদার বিয়ে নিয়ে চরম সংশয় প্রকাশ পেলে সে বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে আসে — ''অতুল শশব্যস্তে হাত ছাড়াইয়া লইয়া আর্দ্রকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কেন এত ব্যস্ত হচ্ছ মাসীমা? আমি কথা দিচ্ছি —'' এই অকপটতা আর সংগোপনতা অতুল চরিত্রের বিশেষ দিক। এখন এর কারণ দেখা যাক।

অরক্ষণীয়া গল্পের প্রেক্ষাপট দ্বিমাত্রিক। কাহিনীর কিছু ঘটনা কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত কোন গ্রামে। সেই গ্রাম থেকে শহর কলকাতার সঙ্গে রেলপথে সহজেই যোগাযোগ করা যায়। অতুল প্রায়ই কলকাতা থেকে পড়াশোনার ফাঁকে গ্রামে আসে, আবার সন্ধ্যার ট্রেনে ফিরে যায়। এ গ্রাম আবার জীবন জীবিকার জন্য কৃষি নির্ভর নয়। গৃহস্থ বাড়ীর অনেকেই অফিস কাছারীর কেরাণী। রেলপথের নিত্যযাত্রী। এক কথায়, এই গ্রামের পরিবেশ, চিরাচরিত গ্রাম্য রক্ষণশীলতা ও শিক্ষার প্রসার, রেলপথের যোগাযোগে ও জীবিকা অর্জনের অনিবার্যতার কারণে শহরমুখীনতার মাঝে থাকা একটা দ্রুত পরিবর্তনশীল শহরতলী। কাহিনীর অপর অংশ ঘটে তারকেশ্বরে, হরিপালে। সে জায়গাটা ম্যালেরিয়ার ডিপো, অজগাঁয়ের অশিক্ষা ও কুরুচি শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন তাঁর ব্যবহৃত ভাষায়। মেয়ে সমেত দুর্গামণিকে দেখে জ্ঞানদার মামার কথা মনে করা যেতে পারে — ''অ্যাঁ - বিয়ে দিস নি? এ যে একটা সোমত্ত মাগীরে দুর্গা?'' কলকাতা শহর অনুপস্থিত থেকেও উপস্থিত এই কাহিনীতে এবং তা বিবৃত অতুলের চরিত্রে, কেননা প্রয়শই তাকে সংকীর্ণতা ও রুচিশীল ঔদার্যের মধ্যে আটকে পড়া মানুষ বলে মনে হয়।

অতুলের চরিত্রে পরিস্ফুট এই দুই পরষ্পর বিরোধী টানের এবার কয়েকটা দৃষ্টান্ত দেখে নেওয়া যাক। দুর্গামণি জ্ঞানদাকে নিয়ে হরিপালে যাওয়ার ঠিক আগে ছোটবৌ, স্বর্ণ ও অতুলের কথোপকথন বোধহয় ভালো উদাহরণ। ''(স্বর্ণ) বলিতে লাগিলেন, কেন ... যদি দরদ জন্মে থাকে, তোমার শাশুড়ী মাসীকে ... করাবে কেন, ঘরেই নিয়ে যাও না। গাঁ শুদ্ধ লোক ... করবে এখন । .... সে বলিয়া বসিল, বেশ ... তোমরা আপনার লোক, কথাটা যদি দুদিন আগে ... থাক ভালইত। ..... তোমাদের গাঁয়ের লোকগুলো ... বাহবা দেবে, কি ছিছি করবে, আমি ভ্রূক্ষেপও করি, কিন্তু পরক্ষণেই অতুল গ্রাম্য সংস্কারের লজ্জায় ... এরপর থেকে শহরের নব্য শিক্ষিত যুবার দৃঢ়তা অতুলের মধ্যে প্রায় অপ্রকাশিত, বরং স্বর্ণমঞ্জরীর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সে তার নীচতাকে সমর্থনে ব্যস্ত। কেবল মাত্র কাহিনীর শেষ অংশে এক অপরাধ বোধ তার মনে নীরবে ... এই বোধ যদি অমলিন মানব চেতনার থেকে উঠে আসে তবে স্বীকার করতেই হবে শহরের শিক্ষার আলোক ... গ্রামের বদ্ধ পরিবেশ থেকে অতুলের বৃহৎ পৃথিবীতে ... সপ্তাহান্তে বেরিয়ে যাওয়া একটা বড় পরিপালিকা শক্তি। এই দীর্ঘ গল্পে অন্য সব চরিত্রগুলিই নিজস্ব গণ্ডীতে আবর্তিত, কেবল অতুলের ক্ষেত্রে তা খাটে না, সে গণ্ডী ... পথে বিবর্তিত ও তাই শেষে হলেও ঠিক সাড়াটা দিতে পারে।

বোধহয় একটা মুশকিল হল, অরক্ষণীয়া শরৎচন্দ্রের গৌণ রচনা, অর্থাৎ অতুল চরিত্রটি সম্ভাবনাময় কিন্তু পূর্ণ প্রকাশিত নয় সম্পূর্ণভাবে কাহিনীর পরিধির সীমাবদ্ধতার জন্য। রচনাকাল বিশ শতকের গোড়ার দিক হওয়ায় এই ধারণা একটু দানা বাঁধে। রেলপথের প্রসার কলকাতার স্বাধীন খোলা মেলা পরিবেশ এবং সর্বোপরি শহরে এসে উচ্চ-শিক্ষা নেওয়ার রেওয়াজ বেশ চালু হতে বোধহয় এই সময়টা লেগে গেছে। ফলতঃ গ্রামের বদ্ধ মানসিকতা ও উদার শিক্ষার মানবতা প্রথম যুগে একটা যুবা চরিত্রে স্ববিরোধের জন্ম দেবেই। তবে এই প্রায় ফাঁদে আটকে পড়া নতুন গ্রামীণ শিক্ষিত সমাজের ক্রম উত্তরণ ঘটবে, এমনতর একটা স্বপ্ন শরৎ মানসিকতায় বোধহয় উপস্থিত। দুঃখের বিষয় ক্যানভাস স্বল্প হওয়ায় তার বিকশিত রূপ অতুলের মধ্যে নেই, থেকে গেছে সম্ভবনাময় কিছু চিহ্ন। তাহলে কি আর একটা অতুল আঁকার সময়ে হয়ে যায়নি?

নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী : এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব

শম্পা চৌধুরী, অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ

ঊনবিংশ শতকের এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী। আনুমানিক ১৮৩৪ সালে কুমিল্লা (তৎকালীন ত্রিপুরাজেলা) জেলার এক বনেদী মুসলমান পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতার নাম জমিদার আহমদ আলিচৌধুরী, মাতার নাম আফরান্নেসা। কুমিল্লা জেলারই হোমনাবাদ পরগনার অন্য এক ভূস্বামীর সন্তান, মোহাম্মদ গাজী চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু বিবাহিত জীবন তাঁর সুখের হয় নি। ফয়জুন্নেসার পিতা মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জমিদারী চার পুত্র কন্যার মধ্যে ভাগ করে দিয়ে যান। এছাড়া স্বামী গাজী চৌধুরীও মৃত্যুর পূর্বে তাঁর জমিদারীর একাংশ ফয়জুন্নেসাকে দান করে যান। পিতৃমাতৃ এবং স্বামীর ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্য অংশ ছাড়াও স্বউপার্জিত ও এক বিরাট এলাকা নিয়ে গঠিত তাঁর জমিদারী এলাকার বার্ষিক আয় ছিল ১ লক্ষ টাকা। শাসনের অন্তরাল থেকেই তিনি যেরূপ যোগ্যতার সঙ্গে জমিদারী পরিচালনা করেছিলেন তাঁর ভ্রাতারা বা তৎকালীন অধিকাংশ পুরুষ জমিদারও তা পারেন নি।

নবাব আব্দুল লতিফ এবং সৈয়দ আমির আলির মতো নবাব ফয়জুন্নেসাও উপলব্ধি করেছিলেন শিক্ষা ছাড়া কোন জাতির উন্নতি সম্ভব নয়। তাঁর কাছে নারী পুরুষ উভয়ের শিক্ষাই সম গুরুত্ব অর্জন করেছিল। তিনি পশ্চিম গাঁওয়ে নিজ বাসস্থানের পাশে স্থাপন করেন একটি মসজিদ। যেখানে দীনিয়াত, পবিত্র কোরান ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হত। এছাড়া ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন একটি অবৈতনিক মাদ্রাসা। নবাব ফয়জুন্নেসা তাঁর জমিদারীর কয়েকটি মৌজায় বালকদের জন্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। (ভাউকসার, ভাটিরা, ছাতার পাইয়া, মানিকমুড়া এবং বাংগড্ডায়) যখন এদেশীয় মুসলমান পুরুষদেরই শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর করানোর জন্য নেতৃবৃন্দ নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন সে সময়ে নারী শিক্ষার কথা ফয়জুন্নেসা শুধু ভাবেননি, তাদের জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির মাধ্যমে এক দুঃসাহসী ভূমিকা পালন করেছেন. কুমিল্লা শহরে মেয়েদের জন্যে তিনি পৃথকভাবে দুটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। একটি কুমিল্লা নানুয়া দিঘীর পশ্চিমপাড়ে, অন্যটি কান্দির পাড়ে ১৮৭৩ সালে। এই দ্বিতীয় বিদ্যালয়টিই বর্তমানে 'ফয়জুন্নেসা উচ্চইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত। তাঁর বাড়িতে অতিযত্নে ও সাধনায় গড়ে উঠেছিল 'ফয়জুন পুস্তকালয়' তৎকালীন যুগে শিক্ষাক্ষেত্রে ফয়জুন্নেসার অবদান সম্পর্কে আব্দুল কুদ্দুস বলেছেন, 'তাঁর চিন্তাধারা শুধু আধুনিক নয় তা অত্যাধুনিক'।

সেযুগে অশিক্ষা ও কুসংস্কারে জর্জরিত মুসলমান সমাজে চিকিৎসার হাল কি ছিল তা সহজেই অনুমেয়। জনদরদী নবাব ফয়জুন্নেসার অন্তর এই দুর্ভাগ্যের বিষয়টি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য স্থাপন করেন লাকসামের দাতব্য চিকিৎসালয়। মানবতার সেবায় ফয়জুন্নেসার সর্বোৎকৃষ্ট অবদান হল কুমিল্লার 'ফয়জুন্নেসা জেনানা' হাসপাতাল' (১৮৯৩) হাসপাতালটির চিকিৎসা ব্যবস্থায় যাতে উন্নত মান রক্ষিত হয় সেজন্যে তিনি 'বেঙ্গল প্রভিন্স কাউন্সিল অব ডাফরিন ফান্ড কমিটি' র হাতে হাসপাতালের পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত করেন।

ফয়জুন্নেসার অপর এক কীর্তি হল ১৮৯২ সালে

সম্পাদিত ওয়াকফ্ নামা। যাতে তিনি তাঁর ১ লক্ষ টাকার বাৎসরিক আয়ের জমিদারীর বিরাট অংশ অর্থাৎ ৬০,০০০ টাকার বাৎসরিক আয়ের জমিদারী আল্লাহর নামে মানবসেবার কাজে দান করে দেন। ওয়াকফ্ দলিল মাফিক তিনি স্বয়ং মাদ্রাসা স্থাপন করেন এবং এই মাদ্রাসায় গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। থাকা ও খাওয়ার ব্যয়ভার তিনিই বহন করতেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রেও তাঁর সেবার হাত প্রসারিত হয়েছিল। দূরদূরান্ত থেকে দেশ বিদেশে যাতায়াতে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য নিজ বাড়িতে তিনি স্থাপন করেন বিরাট মুসাফির খানা। শোনা যায় পবিত্র মক্কায় মাদ্রাসা ও মদিনা শরীফে মুসাফির খানা ও গড়ে উঠেছিল তাঁর অর্থে। আব্দুল কুদ্দুস বলেছেন " জ্ঞানের আলোয় যাঁর প্রাণ আলোকিত সর্বত্র তিনি আলো বিলিয়ে দিতে প্রয়াসী। ভৌগোলিক সীমারেখায় তা আটকে থাকে না।" ফয়জুন্নেসা জনসাধারণের উপকারার্থে তাঁর জমিদারীর প্রতিটি মৌজায় কোথাও দিঘী কোথাও পুকুর খনন করেন। এমনকি পবিত্র মক্কায় হজ করতে গিয়ে তিনি প্রায় শুকিয়ে যাওয়া 'নাহারে জুবায়দা' খালটিরও পুনঃখনন করিয়েছিলেন। রাস্তাঘাটের অভাবে জনসাধারনের চলাচলের কষ্ট লক্ষ্য করে তিনি পশ্চিম গাঁওয়ে বেশ কয়েকটি রাস্তা নির্মাণ করেন। এছাড়া প্রতিটি শীত ঋতুতে তিনি দরিদ্রদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণকে জীবনের একটি কর্তব্য রূপেই গ্রহণ করেছিলেন। পশ্চিম গাঁওয়ে ডাকাতিয়া নদীর উপর তাঁর মাতা আরফান্নেসা কর্তৃক নির্মিত পুলটিও তিনি পুনঃনির্মাণ করেন। তাঁর এইসব কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৮৮৯ সালে রানী ভিক্টোরিয়া তাঁকে 'নবাব' উপাধিতে ভূষিত করেন। বাংলায় তিনিই হলেন প্রথম ও একমাত্র নারী যিনি নবাব খেতাবে ভূষিত হয়েছিলেন।

সবশেষে নবাব ফয়জুন্নেসার অপর এক পরিচয়ের কথা উল্লেখ করা যায়, সেটি হল সাহিত্যসেবী ফয়জুন্নেসা। ১৮৭৬ সালে ঢাকা গিরিশ মুদ্রনযন্ত্র থেকে প্রকাশিত হয় তাঁর গ্রন্থ 'রূপজালাল'। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ১৮৮৬ সালে কলকাতায় স্বর্ণকুমারী দেবী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সখী সমিতির সদস্যাও ছিলেন এই ব্যতিক্রমী নারী।

ব্যক্তিগত জীবনে নবাব ফয়জুন্নেসা ছিলেন নারী, উচ্চশিক্ষা ও ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্ছিন্ন। তথাপি তিনি নিজ প্রচেষ্টায় সমকালীন পুরুষ নেতৃবৃন্দের সমপর্যায়ে নিজেকে উত্তীর্ণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এটি তাঁর বিরাট কৃতিত্ব। তাঁর পূর্বে সমাজ সেবার কাজে নেতৃত্বদানের ভূমিকায় এদেশীয় অন্য কোন মুসলমান নারী অবতীর্ণ হয়েছিলেন কিনা জানা যায় নি। পরবর্তী কালে বিশ শতকের যে নারী সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি বেগম রোকেয়া, নবাব ফয়জুন্নেসা তাঁরই পূর্বসূরী।

শ্রীলঙ্কার গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব ও রাজনীতি

সুমিতা চক্রবর্তী, অধ্যাপিকা, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

ভারতীয় রাজনীতিতে জাতিগত দ্বন্দ্বের যেমন একটা প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে ঠিক তেমনই আমাদের একটা প্রতিবেশী রাষ্ট্রেরও জাতিগত দ্বন্দ্বের অস্তিত্ব আমরা দেখতে পাই। সেই দেশটি হল দক্ষিণ এশিয়ার দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা। শ্রীলঙ্কা হল ভারতের মত একটা বহুজাতি সমন্বিত দেশ। ভারতের মতই এখানে ভাষা এবং ধর্মের পার্থক্য দেখা যায়। ভারতবর্ষে যেমন রাজনীতিতে হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখতে পাওয়া যায় তেমনই শ্রীলঙ্কায় তামিল ও সিংহলীদের ভাষা ও ধর্ম নিয়ে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

শ্রীলঙ্কার জনসংখ্যার তিন চতুর্থাংশ সিংহলী, এদের মধ্যে অধিকাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং সিংহলী ভাষী। আর যে সব অন্যান্য জাতি সেখানে রয়েছে তাদের মধ্যে তামিলরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শ্রীলঙ্কার এই তামিলরা আবার দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি সিংহলী তামিল অর্থাৎ যারা কয়েক শতাব্দি ধরে ঐ দ্বীপে বসবাস করছে, আর একটা ভারতীয় তামিল। এই ভারতীয় তামিলরা উনবিংশ শতাব্দিতে চা বাগানের চাকরীর সূত্রে বসবাস করতে যায়। ভারতীয় তামিলরা হিন্দু এবং তামিল ভাষায় কথা বলে। কিন্তু এই দুই তামিল গোষ্ঠি নিজেদের মধ্যে স্বাতন্ত্র বজায় রাখে।

যদিও তামিলরা শ্রীলঙ্কায় সংখ্যালঘু গোষ্ঠি, তারা শ্রীলঙ্কার উত্তর ও পূর্বাঞ্চল যেমন জাফনা, মান্নার, ভবানীয়া এবং মুল্লটিভু এই চারটি জেলায় অধিক সংখ্যায় বসবাস করে। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশের শৃঙ্খলমুক্ত হবার পর, পরবর্তী এক দশকের মধ্যেই প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠী নিজেদের সম্প্রদায়গত স্বাধিকার বজায় রাখবার জন্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথ অনুসরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবস্থার ওপরেও এই দাঙ্গার প্রভাব দেখা যায়। শ্রীলঙ্কার সংখ্যা গরিষ্ঠ জাতি হিসাবে সিংহলীরা নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য সচেষ্ট হয়। ফলে তামিল এবং সিংহলীদের মধ্যে অশান্তি ধীরে ধীরে প্রকট রূপ ধারণ করতে থাকে।

এছাড়া শ্রীলঙ্কার সংবিধানে একাধিক বিতর্কিত বিষয় সংযোজিত হয়। যেমন এককেন্দ্রিক সরকারের উপস্থিতি এবং আইন পরিষদে আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা। এই দুই বিষয়কে তামিলরা মেনে নিতে পারে নি। কারণ তারা মনে করে যে এর ফলে শ্রীলঙ্কায় সিংহলীদের আধিপত্য কায়েম হবে এবং তারা দ্বিতীয় নাগরিকে পরিণত হবে।

তামিলদের এই সংখ্যালঘুত্বের ভীতি ঔপনিবেশিক আমল থেকেই ছিল। সেইজন্য তারা উপনিবেশিক সরকারের কাছে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য আইনসভায় আধাআধি প্রতিনিধিত্বের দাবি জানায়। ভারতীয় তামিলরাও এই ব্যাপারে শ্রীলঙ্কার তামিলদের সাথে হাত মেলায়। পরবর্তীকালে এই ঘটনাগুলো সিংহলীদের কাছে মারাত্মক বলে মনে হয়েছিল।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ সালে সেনানায়কদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই সরকার নাগরিকতার আইন চালু করে। ফলে শ্রীলঙ্কায় ভারতীয় তামিলরা রাষ্ট্রহীন হয়ে পড়ে। এই ঘটনার প্রতিবাদে সেনানায়কদের ইউনাইটেড ন্যাশানাল পার্টি (UNP) সমর্থনকারী তামিল কংগ্রেসের দলভুক্ত বাণিজ্যমন্ত্রী ক্যাবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। এস.জে.ভি. সেলভাকমের নেতৃত্বে তিনি ফেডারেল পার্টি (FP) গঠন করেন। এই দল যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার, রাষ্ট্রহীন তামিলদের নাগরিকত্ব প্রদান এবং তাদের জন্য প্রাদেশিক স্বাতন্ত্রের দাবি করে। ১৯৫১ সালে এই পার্টির সম্মেলনে বলা হয় যে তামিলরা সিংহলীদের থেকে পৃথক জাতি।

অন্যদিকে ১৯৫১ সালে এস.ডব্লিউ.আর.ডি. বন্দরনায়েক UNP থেকে পদত্যাগ করেন এবং শ্রীলঙ্কা ফ্রীডম পার্টি (SLFP) গড়ে তোলেন। মূলতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সিংহলীদের স্বার্থরক্ষাই ছিল এই দলের লক্ষ্য। তিনি সিংহলী বৌদ্ধদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে তোলেন এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের উদ্ভব হয়। তিনি UNP সরকারের ভাষানীতি এবং ধর্মনীতির সমালোচনা করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন তাহলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিংহলী ভাষাকে সরকারী ভাষার মর্যাদা দেবেন। ফলে সিংহলী শিক্ষিত শ্রেণী, শিক্ষক সম্প্রদায়, শিক্ষিত বেকার এবং নব্য ভিক্ষুরা SLFP-র ভাষানীতির সপক্ষে প্রচার শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে UNP ও তার নীতির পরিবর্তন করে এবং সিংহলীদের পক্ষ নেয়। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে SLFP ৫১ টি আসন পায় এবং UNP ৮টি আসন পায় এবং বন্দরনায়েকের নেতৃত্বে SLFP সরকার গঠন করে।

ফলে তামিলদের পক্ষে কথা বলবার জন্য পড়ে রইল সেলভানায়কমের নেতৃত্বে FP । এই FP উত্তরাঞ্চলে পেয়েছিল ১০টি আসন। তারাই যুক্তরাষ্ট্রীয় নীতির মাধ্যমে তামিলদের জন্য পৃথক রাষ্ট্র ও তামিল ও সিংহলীদের সমমর্যাদা প্রদানের জন্য লড়তে থাকে।

১৯৫৬ সালে সিংহলী ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়। ফলে তামিল অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে FP তামিলভাষার সমমর্যাদার জন্য তীব্র আন্দোলন শুরু করে। তখন বন্দরনায়েক বাধ্য হল FP পার্টির সঙ্গে চুক্তি করতে, যা বন্দরনায়েক সেলভানায়কম চুক্তি (১৯৫৭) নামে পরিচিত। কিন্তু চরমপন্থী সিংহলীরা বন্দরনায়েকের এই নরমপন্থা গ্রহণ করেনি। তাই ২৫ শে সেপ্টেম্বর ১৫৫৯ সালে তাঁকে আততায়ীর হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

পরবর্তী কালে তামিল ও সিংহলীদের ভাষা ও সমমর্যাদার দাবি হয়ে ওঠে রাজনীতির প্রধান ইস্যু। শ্রী বন্দরনায়েক দুটি জাতির মধ্যে পুনর্মিলন ঘটাবার যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তাই রাজনীতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করেছিল।

এরপর ১৯৭০ এর নির্বাচনে মিসেস বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি যে সময়ে প্রধানমন্ত্রীত্বের পদ গ্রহণ করেন তখন দেশে মুদ্রাস্ফীতি, বেকারী, JVP (জনতা বিমুক্তি পেরামুরা)-র অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্ম অত্যধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। JVPর সদস্যরা হল সিংহলী যুবক যুবতী যারা নিজেদের জন্য সরকারী চাকরির দাবি জানাচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে শ্রীমতী বন্দরনায়েক ক্ষমতায় এসেই নতুন সংবিধান চালু করেন (২২ শে মে ১৯৭২)। তাঁর সরকার ঘোষণা করে যে সব আইন সিংহলী ভাষায় জারি করা হবে যদিও প্রত্যেকটি আইনকে তামিল ভাষায়ও অনুবাদের ব্যবস্থা থাকবে। FPর নেতৃত্বে তামিল ভাষা ও সিংহলী ভাষাকে শ্রীলঙ্কার সরকারি ভাষার মর্যাদা দানের জন্য একটি সংশোধনী বিলও উত্থাপিত হয়। কিন্তু সরকার তা প্রত্যাখ্যান করে। এর মধ্যেই আবার সরকার বৌদ্ধধর্মকে অগ্রাধিকার দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

সুতরাং তামিলদের বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সিংহলী সরকারের কাছে কোন সুবিধা পাবার সম্ভাবনা তাদের নেই। ফলে বিদ্যমান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে থেকে তামিলদের জন্য সুযোগ সুবিধা আদায়ের উদ্দেশ্যে F.P., TC শ্রীলঙ্কা শ্রমিক কংগ্রেস এবং তামিল প্রগতিশীল মোর্চা একযোগে তামিল ইউনাইটেড ফ্রন্ট (TUF) গঠন করে।

এই TUF এর লক্ষ্য হিসাবে ঘোষিত হয় যে তারা স্বাধীন, ধর্মনিরপেক্ষ, সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক 'তামিল ইলম' রাষ্ট্র গঠন করবে। এটাই সম্ভবতঃ শ্রীলঙ্কায় প্রথম জাতি ভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের দাবি। ১৯৭৬ সালের নির্বাচনে তামিল ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট (TULF) শ্রীলঙ্কার উত্তরাঞ্চলে ১৪ টি আসন লাভ করে।

১৯৭৭ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে জয়বর্ধনে তামিল ও সিংহলীদের সংঘাত মিটিয়ে ফেলবার জন্য ১৯৭২ সালের যে সংবিধান, তার সংশোধন করেন এবং এই সংশোধনের মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতি শাসন কায়েম করেন। এই সরকার তামিলদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রয়াস প্রভৃত চালায় - যেমন যে ভাষার মর্যাদা নিয়ে তামিলদের ক্ষোভ সেই তামিল ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা তিনি দেন।

কিন্তু এ সত্ত্বেও তামিল যুবকরা এবং যুবতীরা চাকুরী, শিক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়ে সিংহলী নেতৃবর্গের উপর আস্থা রাখতে পারে নি। ফলে গড়ে ওঠে একাধিক হিংসাশ্রয়ী গোষ্ঠি যাদের মধ্যে প্রভাকরণের নেতৃত্বে LTTE (Leberation Tigers of Tamil Elam) এর কথা আমরা সকলেই জানি। এছাড়া অন্যান্য গোষ্ঠি গুলোর মধ্যে আছে (Tamil Eelam Liberation Organisation(TELO)

People's Liberation Organisation of Tamil Eelam (PLOTE) Eelam Revolutionary Organisation of students (EROS) ইত্যাদি।

এইরকম নানা গোষ্ঠি গড়ে ওঠার ফলে শ্রীলঙ্কায় জাতি বিরোধ এক ভয়ঙ্কর রূপ নেয়। ১৯৮৩-র ২৩ শে জুলাই তামিল উগ্রপন্থীরা ১৩ জন সামরিক সিংহলী ব্যক্তিকে হত্যা করে। এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ২৪ শে জুলাই সিংহলীরা জাফনার ৩০ জন তামিল অসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করে। এইভাবে সংঘবদ্ধ হিংসা প্রচন্ডভাবে শুরু হয়। ১৯৮১ সালে যখন জাফনার লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দেওয়া হল তখন হিংসাত্মক কার্যকলাপে পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে।

তারপর যখন প্রত্যক্ষ সেনাবাহিনীর মদতে শ্রীলঙ্কায় দাঙ্গা শুরু হয় তখন প্রচুর তামিল ভারতে চলে আসতে থাকে। ১৯৮৩-র জুলাই মাসের দাঙ্গার পর তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী রামচন্দ্রন মাদ্রাজে এক সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করেন এবং সেখানে দাঙ্গায় সেনাবাহিনীর মদতের তীব্র প্রতিবাদ করেন, সেইসঙ্গে শ্রীলঙ্কার গোষ্ঠিদ্বন্দ্ব অবসানের জন্য দিল্লীর হস্তক্ষেপ আহ্বান করেন। কিন্তু ভারতের হস্তক্ষেপে বিশেষ কোনও ফল হয় নি। তামিলরা শ্রীলঙ্কায় আলাদা জাতিরূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করবার দাবি অব্যাহত রাখে।

উপরন্তু এও দেখা যায় যে, শ্রীলঙ্কায় জাতিদ্বন্দ্বের সমাধান সূত্র খুঁজতে গিয়ে ভারত শ্রীলঙ্কার বিষনজরে পড়ে এবং দুদেশের মধ্যে এক সন্দেহের বাতাবরণ গড়ে ওঠে। এতে সমস্যা আরও ঘনীভূত হয়। তামিলরা বুঝতে পারে যে তাদের দাবি আদায়ের একমাত্র পথ হল দাঙ্গা-হাঙ্গামা। শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী প্রেমদাসা এবং নিরাপত্তামন্ত্রী ললিথ আথুলামুদালি সরাসরি অভিযোগ করেন যে, ভারতে তামিল উগ্রপন্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। শ্রীলঙ্কার উত্তর পূর্বাঞ্চলের তামিলদের হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ দমন করবার জন্য শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি সামরিক অভিযানের নির্দেশ দেন। কিন্তু তাতেও অবস্থা আয়ত্তে আনতে না পেরে শ্রীলঙ্কা নিজে থেকেই ভারতের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।

সেই সময় জাফনার উগ্রপন্থীদের কার্যকলাপকে দমন করবার জন্য শ্রীলঙ্কার সরকার জাফনায় অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে। ফলে জাফনার সাধারণ মানুষ প্রভূত অসুবিধায় পড়ে। তখন ভারত মানবিকতার খাতিরে জাফনায় কিছু সাহায্য পাঠায়। যদিও এই সাহায্য পাঠানোকে নানাভাবে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু এতে একটা সুবিধাও হয়। সুবিধাটি হল ইন্দো-শ্রীলঙ্কা চুক্তির পথ প্রশস্ত হয়।

অবশেষে ১৯৮৭ সালে ২৯ শে জুলাই ঐতিহাসিক ভারত-শ্রীলঙ্কা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি উভয়দেশের মতবিরোধের অবসান করে উগ্রপন্থা দমনের সঠিক পদক্ষেপ নেবার ব্যবস্থা করে। এই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতীয় শান্তিরক্ষাবাহিনী (IPKF) শ্রীলঙ্কায় যায়।

কিন্তু সিংহলীরা এবং তামিলরা উভয়েই এই চুক্তির বিরোধিতা করে। সিংহলী রাজনীতিবিদরা এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই চুক্তিকে শ্রীলঙ্কার সার্বভৌমত্বের অবমাননা বলে মনে করেন। LTTE গোষ্ঠিও এই চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে। যদিও এই চুক্তির পর সামান্য পরিমান অস্ত্র উগ্রপন্থীরা IPKF এর কাছে সমর্পন করেছিল। কিন্তু এই সময়ে ১২ জন LTTE গেরিলা IPKF এর হাতে ধরা পড়ে আত্মহত্যা করে। এই ঘটনার পর LTTE পুরোপুরি ভাবে IPKF -এর বিরোধিতা করে। তারা তামিলদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রগঠনের দাবি থেকে সরবার জন্য কোনওরকম রফায় রাজি হয় না। ফলে বিভিন্ন উগ্রপন্থী গোষ্ঠী যাদের মধ্যে ছিল হিন্দু তামিল এবং মুসলমান তামিল তারাও পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়। এই সমস্ত দ্বন্দ্বে যদিও LTTE সর্বাধিক শক্তিশালী ও সক্রিয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয়। এরাই মূলতঃ শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির মূলে দাঁড়িয়ে আছে।

এরই মধ্যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রেমদাসা উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হন। এই রকম অস্থির পরিস্থিতিতে SLFP নেত্রী চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা নির্বাচনে জয়লাভ করেন এবং ক্ষমতায় আসীন হন। তিনিও এই উগ্র জাতিসমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সূত্র সন্ধান করে চলেছেন। কিন্তু এই সমাধান খুঁজে বার করা বা তামিল ও সিংহলীদের ঐক্যবদ্ধ করা বোধহয় তার পক্ষে সহজ হবে না। কারণ মনে মনে এই দুটি জাতি দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং তার পরিণাম এই দ্বীপরাষ্ট্রের দ্বিখন্ডীকরণ।

গ্রন্থপঞ্জি ঃ-

1) Wilson . A. J. – Politics Sri Lanka - (1947-73)

2) Ram Mohan – Sri Lanka : The Fractured Island.

।। সংস্কৃত সাহিত্যের কাব্য সৌন্দর্য ও ভাবঐশ্বর্য্যের একঝলক ।।

দেবযানী হালদার, অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

ভারতীয় ভাবধারায় বাল্মীকিকে 'আদিকবি' এবং তাঁর রামায়ণকে 'আদিকাব্য' বলে সম্মান করা হয়। ভারতীয় ঐতিহ্য বলতে চায় বাল্মীকির মধ্যে কাব্যিক প্রতিভার যে উদয়কাল তা ভারতীয় কাব্য সাহিত্যেরও আবির্ভাবকাল বটে। রসধ্বনিই যে কাব্যাত্মা এই কথা আলোচনা করার সময় প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক আনন্দবর্ধন মন্তব্য করেছেন –

'কাব্য সপ্রত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।

ক্রৌঞ্চ দ্বন্দ্ব বিয়োগোত্থঃ লোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ।।'

রামায়ণ হল সর্বপ্রথম কাব্য যেখানে চেতনা প্রবাহ এবং উদ্দেশ্যাবলী একটি শিল্পসম্মত বাণীরূপ লাভ করেছে। রামায়ণের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সামগ্রিক ঐক্য লক্ষণীয়। আনন্দবর্ধনের মতে সমগ্র রামায়ণে প্রধান একটিই মূলসুর ব্যঞ্জিত হয়েছে তা হল করুণরস। সমগ্র কাব্যের মধ্যেই তা পরিব্যাপ্ত। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য যে সব ভাবাবেগ কাব্যের মধ্যে সমাগত তার সঙ্গে এই মূলরস শৈল্পিক সংহতি রক্ষা করে চলেছে।

আমাদের মুগ্ধ করে রামায়ণের সহজ সাবলীল সুন্দর কাব্যনির্ঝর, পরবর্তীকালের ক্ল্যাসিকাল কাব্যের অলংকরণের অতিরিক্ততার মতো কোন আতিশয্য যাকে এতটুকু বাধাপ্রাপ্ত করেনি। শুষ্ক কৃত্রিমতা নয়, কমনীয় সারল্যের জন্যই বাল্মীকির ভাষায় এসেছে অভূতপূর্ব ওজস্বিতা। রাবণ কর্তৃক অপহরণের সময় সীতার জ্বালাময়ী নৈতিক ক্রোধ সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে অতুলনীয়–

ক্ষুধিতস্য হি সিংহস্য মৃগশত্রোস্তরস্বিনঃ

আশীবিষস্য বদনাদ্ দংষ্ট্রামাদাতু মিচ্ছসি ।।

অক্ষি সূচ্যা প্রমৃজসি জিহ্বয়া লেঢি চ ক্ষুরম্।

রাঘবস্য প্রিয়াং ভার্যাং যোহধিগন্তুং ত্বমিচ্ছসি।।

রাবণের প্রচণ্ড মদগর্বিতাও আশ্চর্যজনক প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি সাধারণ ছত্রের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে–

উদ্বহেয়ং ভুজাভ্যাম্ তু মেদিনীম্ অম্বরেস্থিতঃ।

আপিবেয়ং সমুদ্রং তু হন্যাং মৃত্যুং রণে স্থিতঃ।।

মানবচরিত্র এবং মানবিক অনুভূতিই বাল্মীকির কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। রাম যখন বর্ষা ঋতুর বর্ণনা দেন তখন তাতে ভেসে ওঠে প্রেমিকার থেকে বিচ্ছিন্ন একজন প্রেমিকের দুঃখভারাতুর চিত্তলোক – 'সীতেব শোকসন্তপ্তা মহী বাষ্পং বিমুঞ্চতি।' আবার রাবণের উদ্ধত চরিত্রটিও একটিমাত্র ছত্রের সাহায্যে প্রকটিত – 'মামাসীনং বিদিত্বেহ চন্দ্রায়তে দিবাকরঃ।' সূর্য তার ভয়ে চন্দ্রের মতো আচরণ করছে।

হনুমান যখন অশোকবনে সীতার দেখা পেলেন বাল্মীকি তখন বেদনাভারাক্রান্ত নিঃসঙ্গ রমণীর অবিস্মরণীয় চিত্র তুলে ধরেছেন।

'উপবাস কৃশাং দীনাং নিঃশ্বস সন্তীং পুনঃ পুনঃ।

দদর্শ শুক্লপক্ষাদৌ চন্দ্রলেখামিবাখলাম্।।

শোকজালেন মহতা বিততেন ন রাজতীম্।

পিনধ্বং ধূমজালেন শিখামিব বিভাবসোঃ।।'

মধ্যগগনে চন্দ্রের সৌন্দর্য প্রকাশিত হল নৃত্যপর ছন্দের মধ্য দিয়ে –

'ততঃ স মধ্যংগতমংশুমন্তং জ্যোৎস্নাবিতানং মহদুদ্বহন্তম্।

দদর্শ ধীমান্ দিবি ভানুমন্তং গোষ্ঠে বৃষং মত্তমিব ভ্রমন্তম্।।'

রামায়ণের মত মহাভারত ভারতীয় সমাজজীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বসাহিত্যে কদাচিৎ আমরা এই প্রকার গ্রন্থ দেখতে পাই যেখানে সৌন্দর্যবিজ্ঞানকে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে এত সুন্দর ভাবে একত্রিত করা হয়েছে। মহাভারতের মধ্য দিয়ে মোক্ষ এবং বৈরাগ্যের বাণী শোনা গিয়েছে। কাব্যসৌন্দর্যের সঙ্গে শাস্ত্ররূপের অনবদ্য সংমিশ্রণ মহাভারতের অসাধারণ বৈশিষ্ট্য যা ভারতীয় সংস্কৃতি জগতে একে অমরত্ব দান করেছে। সমালোচক Boas কবি শেক্সপীয়ারের রচনা সম্বন্ধে যে 'multivalence' কথাটি ব্যবহার করেছেন তা কিন্তু মহাভারতের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। মহাভারতে রয়েছে ব্যাপক সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, ধর্মীয় এবং নৈতিক মূল্যের পরিচয়।

'রাজধর্ম পর্বাধ্যায়' অধ্যয়ন করলে প্রাচীন যুগের সাম্যবাদ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায় –

'নবৈ রাজ্যং ন রাজাসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মেণৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম্।।'

সামাজিক নীতিশাস্ত্রের দিক থেকে 'অনুশাসনপর্ব' অপরিহার্য। বিদুরনীতি নৈতিকতার দিক থেকে অসামান্য -

'একঃ স্বাদু ন ভুঞ্জীত একশ্চার্থান্ন চিন্তয়েৎ।
একো ন গচ্ছেদধ্বানং নৈক সুপ্তেষু জাগৃয়াৎ।।'

ধ্বংসের বিরুদ্ধে শান্তির বাণীরূপে শ্রীকৃষ্ণের কথাগুলোর চিরায়ত মূল্য রয়েছে –

'পর্যস্তাং পৃথিবীং পুণ্যাং সাশ্বাং সরথকুঞ্জরম্।
যো মোচয়েন্ মৃত্যুপাশাৎ প্রাপ্নুয়াদ্ ধর্ম মুত্তমম্ ।।'

যুদ্ধের আগে ভীষ্মের নৈতিক দুর্বলতার প্রকাশ মহাভারতের ভাবঐশ্বর্য্যের পরাকাষ্ঠা –

'অর্থস্য পুরুষোদাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ।
ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোহ স্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।।'

মহান কর্ণের প্রবঞ্চক ভাগ্যের নির্মমতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে মহাভারতকার এক জীবন্ত সত্যকে তুলে ধরেছেন –

'সূতো বা সূতো পুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্।।'

মহাভারতই হল একমাত্র সাহিত্য কর্ম যেখানে সৌন্দর্যবিজ্ঞানের পূর্ণতাকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে পদচারণা করতে গেলে প্রথমেই যে কবি আমাদের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হন তিনি আর কেউ নন তিনি হলেন ভারতের কবিকুলচূড়ামণি কালিদাস। ঋষিকবি ব্যাস ও বাল্মীকির পরে তিনিই শ্রেষ্ঠ মহাকবি। তাঁর কাব্য ভারতবর্ষের হৃদয়কে অতি নিবিড় ভাবে আপ্লুত করেছে । শুধু ভারতবর্ষের চতুঃসীমার মধ্যেই কালিদাসকাব্যের গৌরব আবদ্ধ নয় । দেশ এবং কালের সীমা অতিক্রম করে এর আবেদন বিশ্বহৃদয়ের অভিমুখে পৌঁছেছে। তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় সভ্যতার আত্মিক রূপ, অসাধারণ কাব্য প্রতিভা ও গভীর রসবৈশিষ্ট্য, ভোগ-বিলাস, প্রেমসম্ভোগ ও জীবন ধর্মের উপরও যে কল্যাণ ধর্মের সংযমের, ত্যাগের মাধুর্য্য আছে তা সত্য শিব ও সুন্দরের যে আদর্শ আছে মহাকবি তা ভোলেননি।

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম রচনা। রচনার লালিত্য সরলতা ও স্বচ্ছতা হৃদয়গ্রাহী। ঋতুচক্রের আবর্তনে প্রকৃতির জগতে শোভার যে বিবর্তন ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে মানবমনের উপর প্রকৃতির প্রভাব যে কতখানি তা তিনি রূপে, রসে, রঙে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কালিদাস রচনাবলীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও সম্পূর্ণ মৌলিক রচনায় মেঘদূত মন্দাক্রান্তার ধীরললিত গম্ভীর বিন্যাসে প্রেমের আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় গীতিকাব্যের সাম্রাজ্যে অতুলনীয় গৌরববাহী। এখানে মেঘের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে। মেঘ দেখে প্রেমসুখে মগ্ন মানুষের হৃদয়েও অজ্ঞাত বিরহের আশঙ্কা জেগে ওঠে। মেঘদূতে কবি যে বর্ণনা দিয়েছেন তার আবেদন আজ বিশ্বাভিমুখী। একালের ইংরাজী সাহিত্যে যাকে লিরিক বলে মেঘদূত তা নয়। কিন্তু লিরিকের মৌল উপাদান আত্মমগ্ন ভাবোচ্ছ্বাস এতে বর্তমান। বিরহী হৃদয়ের উৎকণ্ঠা, প্রণয়ের আসঙ্গলিপ্সা,

অপূর্ণ বাসনা-কামনার আর্তি এই কাব্যটিকে অনন্য সুলভ মাধুর্যে মন্ডিত করেছে। আষাঢ়ের ধারাসম্পাতে নিখিল বিরহী হৃদয়ের মুখর গীতিকা যেন বহু ধারায় বর্ষিত। পার্থিব বিরহবেদনার বিশ্বব্যাপী অলৌকিক অনুভূতির আনন্দই মেঘদূতের বার্তা। প্রেমের অপূর্ণতাই বিরহ, প্রণয়ের অতৃপ্তিই বিরহের সাহিত্যকে মানুষের অন্তরে মহনীয় করে তোলে। সংস্কৃত সাহিত্যে প্রেমিক-প্রেমিকার বিরহ, বৈষ্ণবকাব্যে তার সঙ্গে হৃদয়ের বিরহ – আধুনিক রোমান্টিক কাব্যে তাই অতীন্দ্রিয় নিখিল-বিরহে রূপান্তরিত। রবীন্দ্রনাথ মেঘদূতের মধ্যে শাশ্বত সৌন্দর্য ও আনন্দের তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে - 'পূর্বমেঘে বহু বিচিত্রের সহিত সৌন্দর্যের পরিচয়, উত্তরমেঘে সেই একের সহিত আনন্দের সম্মিলন। মেঘ আসিয়া বাহিরে যাত্রা করিবার জন্য আহ্বান করে - তাহাই পূর্বমেঘের গান এবং যাত্রাশেষে চিরমিলনের আশ্বাস দেয় তাহাই উত্তর মেঘের সংবাদ'।

কুমারসম্ভবে মহাকবি কালিদাস আত্মসংবৃত প্রেমের যে জয় সেই ভাবসত্যকেই তুলে ধরেছেন। ধর্ম এখানে দুই হৃদয়কে একত্র করেছে, পরিণয়ের পবিত্র বন্ধনে মিলনোৎসব সংঘটিত হয়েছে, তিনি সৌন্দর্য ও প্রেমকে, সত্য ও শিবকে অভিন্ন সূত্রে বেঁধেছেন কুমারসম্ভবরূপ মঙ্গল প্রয়োজনে তা উদ্দিষ্ট। এই সামঞ্জস্যে ভারতবর্ষ কল্যাণের পথ খুঁজেছে।

রঘুবংশ মহাকাব্যে বর্ণনার বৈচিত্র্যে, ছন্দের মাধুর্য্যে উপমানৈপুন্যে, জগৎ ও জীবনের সূক্ষপর্যবেক্ষণে এবং ভাবসুষমার পরিপাটিতে কবি কালিদাস রামায়ণের পুরনো কাহিনীকে অভিনব রূপ দান করেছেন। ভোগসর্বস্ব গর্হিত জীবনের কদর্যতার মধ্যে যে মহতী বিনষ্টি মানবকল্যাণের পূজারী কালিদাস সেই প্রত্যয় স্থাপনের আগ্রহেই রঘুবংশের কাব্যটিকে চরম পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়েছেন। দ্বিতীয় সর্গে নন্দিনী পরিচর্যার দৃশ্যে দিলীপ পত্নী সুদক্ষিণা আগে চলেছেন মধ্যে নন্দিনী এবং পেছনে রাজা ধেনুটি যেন দিনরাত্রির মধ্যবর্তিনী সন্ধ্যা। কি সুন্দর উপমা। ভৌগোলিক চিত্রমালা বর্ণনে প্রথমেই দেখা গেল রামেশ্বর সেতুবন্ধ নীল সমুদ্রকে যেন দ্বিধা বিভক্ত করেছে। তারপরেই দূর থেকে লৌহচক্রের মত দৃশ্যমান নীলতমাল ও 'তালীবন' শ্যামল কলঙ্করেখার মত শোভিত সমুদ্রের বেলাভূমি। কালিদাসের কাব্যে প্রতিফলিত ভৌগোলিক চেতনার প্রকাশ ভারতবাসীর অন্তরে মমতাময় এক গভীর ঐক্যবোধ সঞ্চালিত করে। ষষ্ঠ সর্গে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর বর্ণনায় দীপশিখার একটি প্রসিদ্ধ উপমা প্রবাদবচনে পরিণত –

'সঞ্চারিণী দীপশিখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ায় পতিংবরা।
নরেন্দ্রমার্গাট্ট ইব প্রপেদে বিবর্ণভাবং সস ভূমিপালঃ।।"

সংস্কৃত নাটকে কালিদাসের মুন্সীয়ানার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় বিক্রমোর্বশীয় নাটকে। সংস্কৃত নাটকে বিষাদময় পরিণতি বিরল। তাই মূলের বিয়োগান্ত ঘটনাকে কবি কৌশলে মিলনান্ত করেছেন। চতুর্থাঙ্কে উর্বশীকে হারিয়ে পুরূরবা উন্মত্ত প্রায়। বনপ্রকৃতি তারই প্রেয়সীর ছায়ারূপে আভাসিত। বিরহার্ত প্রেমিকের সেই করুণ বিলাপ গীতিকাব্যের চমৎকারিতায় পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের পক্ষে অমূল্য সম্পদ। নাটকটিতে চিরন্তন নারীহৃদয়ের অনুরাগ অপূর্বশোভনা উর্বশীর চরিত্রে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সেই অনুরাগের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়েছে মর্তের প্রেমতৃষ্ণা।

নাট্যকলার বৈচিত্র্যে কাব্যশিল্পের সৌন্দর্যে এবং পবিত্রতার প্রত্যয়ে মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ নাটকটি সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বোৎকৃষ্ট রত্ন। তাই বলা হয় – 'কালিদাসস্য সর্বস্বমভিজ্ঞানশকুন্তলম্'। চতুর্থাঙ্কের বিদায়ক্ষণে প্রকৃতি ও মানুষের সহমর্মিতার করুণ চিত্র কবি পাঠককে উপহার দিয়েছেন। তনয়ার প্রতি কণ্বমুনির উপদেশে আদর্শ গৃহিনীর কর্তব্যের যে পরিচয় আমরা পাই ইতিহাসে তার তুলনা নেই। শকুন্তলা নাটক কালিদাসের অপরা সৃষ্টি। প্রেমের সকল সৌন্দর্য মাধুর্য ও উন্নত চিন্তাপর্যায় কবি তার নাট্যপ্রতিমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। এই নাটকে বহিঃপ্রকৃতিকে কালিদাস শুধু বাইরের পটভূমি করে রাখেননি প্রকৃতি তার প্রকৃতিগত রূপ বজায় রেখেই অনসূয়া প্রিয়ংবদার মত নাটকীয় পাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। এই নাটকে কবি যে ভাবে দুষ্যন্ত শকুন্তলার রূপজপ্রেমের তরল প্রকৃতিকে দুর্বাসার অভিশাপের কঠোরতার স্পর্শে ঘনীভূত করেছেন বিশ্বসাহিত্যে তা বিরল। জীবনধর্মের উপরও যে একটি ধর্ম আছে যেখানে নিয়ম

আছে, সংশয় আছে, ত্যাগ আছে, মঙ্গল আছে, মাধুর্য্য আছে, সেই সত্যকে কালিদাস বড় করে দেখিয়েছেন। শকুন্তলার নিজের প্রেমবৃত্তি কাছে যখন দুষ্যন্তই সব, আশ্রমধর্ম আতিথ্যধর্ম কিছু নয় তখন তাতে আর মঙ্গল রইল না।

রাজা দুষ্যন্তের সার্থক মিলন ঘটল মারীচ আশ্রমের দিব্যভূমিতে। সেই মিলন পর্বে শকুন্তলার প্রেম হয়েছে নিকষিত হেম। তিনি সেদিন শুধু দুষ্যন্তের প্রেয়সী নন তনি শ্রেয়সী কল্যাণ মাধুর্যের প্রতিচ্ছবি। রবীন্দ্রনাথের কথায় –'শকুন্তলায় একটি পূর্বমিলন ও একটি উত্তরমিলন আছে। প্রথম অঙ্কবর্তী সেই মর্তের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্ব মিলন হইতে স্বর্গ তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তর মিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক।'

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যপ্রতিভার পরবর্তীকালে যাকে পাওয়া যায় তিনি হলেন ভবভূতি। তাঁর কাব্য প্রতিভা প্রধানতঃ দৃশ্যকাব্যকে অবলম্বন করেই চরম বিকাশ লাভ করেছে। দৃশ্যকাব্যও কাব্য। তাই কাব্যে বর্ণনার প্রাধান্য সর্বজনসম্মত। নিসর্গ প্রকৃতি ও মানব প্রকৃতি এরা পরস্পরের পরিপূরক। এ চিন্তা ভারতীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাঁর উত্তররামচরিতে দন্ডকারণ্য ও পঞ্চবটীর নানা নিসর্গচিত্রের অবতারণা রয়েছে। তমসা, মুরলা, ভাগীরথী, পৃথিবী প্রভৃতি এখানে মানবীয় ব্যক্তিত্বে অনুরঞ্জিত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। ভবভূতি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন 'ভবভূতির রূপবর্ণনা শুভ্র বিদ্যুতের জ্যোতি। কালিদাস যখন মাটিতে চলে যাচ্ছেন ভবভূতি তখন উর্ধ্বে বিচরন করছেন।' ভবভূতির নাট্য রচনার মানবিকরাজ্যে ব্যাপক প্রেমসত্তার দৃষ্টান্ত নানা ভাবে ছড়িয়ে আছে। ভবভূতি সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশিষ্ট প্রেমের নিখুঁত চিত্রণও আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। যে প্রেম মানুষকে দান করে এই মর্তভূমিতে মৃত্যুঞ্জয়ীশক্তি এবং মহত্তম প্রেরণা। ভবভূতি নারীদের সম্বন্ধে উচ্চধারণা পোষণ করতেন। কুলকন্যাদের বিয়ে করে কেউ তাকে দুর্বাক্য প্রয়োগে জর্জরিত করুক এবং তার সঙ্গে দাসীর মত আচরণ করুক তা ভবভূতির অভিপ্রেত ছিলনা। এর থেকে বোঝা যায় স্ত্রীলোকেদের নিয়ে ভবভূতির দৃষ্টি ছিল অনেক উদার। তার মালতীমাধব নাটকে এর পরিচয় আছে। উত্তর রামচরিতে সীতার স্পর্শে রামের ইন্দ্রিয় অচ্ছন্ন হয়েছে চেতনাশক্তি ঘুরতে ঘুরতে মিলিয়ে যাচ্ছে। রামের এই উক্তির মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত ভবভূতির প্রেমভাবনা আধুনিককালের কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বকে আমাদের স্মৃতিতে জাগিয়ে তোলে। রবীন্দ্রনাথ মানসীর 'পূর্বকথা' কবিতায় লিখেছেন-

'অনাদিবিরহ বেদনা ভেদিয়া
ফুটেছে প্রেমের সুখ
যেমনি আজিকে দেখেছি তোমার মুখ
সে অসীম ব্যথা অসীম সুখের
হৃদয়ে হৃদয়ে রহে,
তাই তো আমার মিলনের মাঝে
নয়নে সলিল বহে।'

সংস্কৃত সাহিত্যের ব্যাপকত্ব অনেক যার আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। সংস্কৃত সাহিত্যের শব্দার্থের মধ্যেই এমন ভাবদ্যোতনা আছে এমন ব্যঞ্জনা আছে যা প্রচলিত অর্থকে ছাড়িয়ে বহুদূরে গিয়ে রসবোধ উদ্দীপিত করে। সংস্কৃত কবিদের বাক্ প্রতিমা নব নব উন্মেষশালিনী প্রতিভার ও অসামান্য কল্পনাশক্তির আলোকে উদ্ভাসিত এর ওপর আছে রুচির ঐশ্বর্য, মার্জিত রসবোধ, ধর্মের উন্নয়নী প্রভাব এবং সত্য সুন্দরের অমল অনুভূতি।

হোমিওপ্যাথি— বিজ্ঞান না অপবিজ্ঞান

ডাঃ সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক, পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

পীড়িত মানুষের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যতজন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেছেন আমার মতে তাঁদের মধ্যে হ্যানিম্যানের অবদানই সর্বশ্রেষ্ঠ। কারণ, বিজ্ঞান ও দর্শনের যুগপৎ সম্মেলনে মহাত্মা হ্যানিম্যান শুধু হোমিওপ্যাথি আবিষ্কার করেন নি, বিশ্বপ্রকৃতির শক্তিতত্ত্ব প্রথমে তাঁরই চোখে ধরা পড়েছিল।

হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রের জনক হ্যানিম্যান ১৭৫৫ সালের ১০ এপ্রিল জার্মানির স্যাক্সন প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। হোমিওপ্যাথি যে প্রাকৃতিক সূত্র মেনে চলে বহু পূর্ব হতেই তা মানুষের জানা ছিল। কিন্তু তিনিই প্রথম চিকিৎসার মূল ভিত্তি হিসাবে এই সূত্রকে প্রতিষ্ঠা করেন।

চব্বিশ বৎসর বয়সে হ্যানিম্যান ভিয়েনার Erlangen University থেকে MD উপাধি লাভ করেন। সাতটি ভাষাবিশারদ হ্যানিমান ১৭৯০ সালে Cullen এর Materia Medica অনুবাদ করতে গিয়ে এক জায়গায় লেখা আছে দেখলেন যে সিঙ্কোনা গাছের ছাল একটি সুস্থ লোকের দেহে ম্যালেরিয়া রোগ লক্ষণ সৃষ্টি করে। সিঙ্কোনা গাছের ছাল যে ম্যালেরিয়া রোগের ওষুধ তা অনেকদিন আগে থেকেই মানুষ জানত। সত্য যাচাই করার জন্য হ্যানিম্যান কয়েক দিন ধরে সিঙ্কোনার রস খেলেন। সত্যই তাঁর মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ লক্ষণ দেখা দিল। সিঙ্কোনা খাওয়া বন্ধ করতেই তিনি আবার সুস্থ শরীর ফিরে পেলেন। তাঁর মাথায় এই চিন্তা খেলে গেল যে শুধু সিঙ্কোনা নয়—সমস্ত ওষুধের ক্ষেত্রে এটা সাধারণ সত্য। যে ওষুধ খেলে সুস্থ দেহে যে যে লক্ষণ সৃষ্টি হয়, রুগীর ক্ষেত্রে সেই একই লক্ষণাদি থাকলে ওই ওষুধই সেই রোগ নিরাময় করে। দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে নিজের উপর এবং অন্তরঙ্গদের উপর বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ করে তিনি এই উপলব্ধি করেন যে তাঁর অনুমানই সত্য। ১৭৯৬ সালে একটি Journal এ তিনি এই আবিষ্কার জনসমক্ষে প্রকাশ করেন।

১৮১০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'Organon of medicine' বইতে তিনি হোমিওপদ্ধতির মূল তত্ত্ব ও ব্যবহারিক দিক সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেন। ১৮১১ থেকে ১৮২১ সালের মধ্যে তিনি আট খন্ডে প্রকাশ করেন 'Materia Medica Pura' যাতে তিনি সুস্থ শরীরের উপর বিভিন্ন ওষুধের ক্রিয়া বর্ণনা করেন। ১৮২৮ সালে দুই খন্ডে প্রকাশিত হয় 'Chromic diseases'।

প্রায় সারা জীবন তাঁকে অশেষ দুঃখ লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। বিভিন্ন সময় তাঁকে বিচারের সম্মুখীন হতে হয় এবং ওষুধ দেবার ক্ষেত্রে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। ফলে অবিরত তাঁকে বাসস্থান পালটাতে হয়। অবশেষে ১৮৩৫ সালে তিনি ফ্রান্সবাসী হন। এখানে তিনি পূর্ণ স্বীকৃতি ও মর্যাদা পান এবং প্রভূত যশ ও অর্থের অধিকারী হন। এই পুণ্যাত্মা ১৮৪৩ সালের ২রা জুলাই দেহরক্ষা করেন।

হোমিওপ্যাথির মূল নীতিসমূহ

১) সদৃশ বিধান :

'Similia Similibas Curantur' i.e. 'Like Cures Like' প্রাকৃতিক এই নিয়মটি মাঝে মাঝেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে প্রাচীন চিকিৎসকদের নজরে আসে।

যেমন, দীর্ঘদিন হার্পিস উদ্ভেদ (rash) এ ভোগা রুগী হামের আক্রমণে হার্পিস রোগ থেকে চিরমুক্ত হয়। কারণ হামরোগের প্রধান লক্ষণই হল এই ধরণের উদ্ভেদ।

হ্যানিম্যানই প্রথম উপরোক্ত সূত্রকে, চিকিৎসার বাধ্যতামূলক পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করে বললেন 'Similia similibus Curentur' i.e. 'Let likes be treated by likes'।

২) কোন সময়ে একটি মাত্র ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম :

৩) ন্যূনতম ওষুধ প্রয়োগের নিয়ম :

৪) ওষুধের গুণাগুণ পরীক্ষা (Drug proving) :

বিভিন্ন বয়সের সুস্থ নারী পুরুষ নির্বাচন করে তাদের উপর স্বল্প পরিমাণে ওষুধ প্রয়োগ করে ফলাফল ডায়েরী আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়।

অন্য সমস্ত চিকিৎসাপদ্ধতিতে স্থূল পরিমাণে ওষুধ জীবজন্তু বা অসুস্থ লোকের উপর প্রয়োগ করে ফলাফল দেখা হয় বা দুর্ঘটনা ও আত্মহত্যাজনিত ঘটনা থেকে ওষুধের বিষময় গুণ জানা হয়। এই সমস্ত ক্ষেত্রেই ওষুধের সূক্ষ্ম নিরাময় শক্তি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

৫) ক্রনিক রোগ : উনচল্লিশ বছরের দীর্ঘ সাধনা থেকে হ্যানিম্যান এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান যে রোগ দ্বিবিধ তরুণ ও পুরাতন (Acute and chronic), তরুণ রোগ হঠাৎ আক্রমণ করে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হয় রোগীকে শেষ করে ফেলে বা নিজেই শেষ হয়ে যায়।

ক্রনিক রোগের মূল কারণ (বা Miasm) তিনটি— সোরা, 'সিফিলিস ও 'সাইকোসিস'; আয়ুর্বেদের 'বায়ু', 'পিত্ত', 'কফ' (যথাক্রমে) এর সঙ্গে তুলনীয়। এইগুলি নানা রূপে সারাজীবন কষ্ট দেয় এবং বিভিন্ন রোগ হিসাবে দেখা দেয়। বর্তমান যুগে বিভিন্ন টীকাকরণের কুফলের জন্য যুক্ত হয়েছে আরও একটি মায়াজম - ভ্যাকসিনোসিস। ওষুধের মধ্যেও এরূপ স্বল্পমেয়াদী বা সুগভীর দু ধরনের ওষুধ আছে।

৬) ওষুধকে সূক্ষ্ম দীর্ঘমেয়াদী স্তরে আনয়ন (Drug dynamisation) : এই পদ্ধতিতে ওষুধের পরিমাণ কমে কিন্তু সেটা আরও গভীর স্তরে গিয়ে কাজ করে এবং তার নিরাময় ক্ষমতা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। স্থূল ওষুধ এই স্তরে কখনই পৌঁছাতে পারে না।

৭) জীবনীশক্তির নীতি : এই জীবনীশক্তি মানুষের প্রাণদায়ী শক্তি যা জীবিত মানুষের সমস্ত কাজকর্মের সামঞ্জস্য বিধান করে। সমস্ত শক্তির মত এই শক্তিও অদৃশ্য এবং একমাত্র জীবন্ত দেহের ক্রিয়ার মাধ্যমেই একে জানা যায়। এই জীবনীশক্তি ছাড়া একটি অটুট দেহ নিষ্প্রাণ এবং কর্মশক্তিহীন। আবার দেহ ছাড়া জীবনীশক্তিও অস্তিত্বহীন। কাজেই দেহ ও জীবনীশক্তি একটি অভিন্ন একক। একটি অপরটি ছাড়া বোঝা সম্ভব নয়।

জীবনীশক্তি সূক্ষ্ম বলে একমাত্র কোন সূক্ষ্ম শক্তিই এর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। কোন জড়বস্তু রোগের মূল কারণ হতে পারে না। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এইসব জীবাণু কখনই আমাদের রোগের প্রকৃত কারণ হতে পারে না। জীবনীশক্তির সূক্ষ্ম বিকৃতিই হল রোগ যা নিরাময় করা কেবল সূক্ষ্ম ওষুধের পক্ষেই সম্ভব।

এখন জীবনীশক্তির এই সূক্ষ্ম বিকৃতি বা রোগ চেনার উপায় কি? দেহের স্বাভাবিক অনুভূতি ও ক্রিয়া হল সুস্থ জীবনীশক্তির প্রকাশ। অস্বাভাবিক অনুভূতি ও ক্রিয়াদি (লক্ষণাবলী বা Symptoms) হল বিকৃত জীবনীশক্তি বা আভ্যন্তরীণ রোগের বহিঃপ্রকাশ। কোন ব্যক্তির সম্পূর্ণ symptoms-ই হল তার রোগ এবং এগুলি যে ওষুধে আছে তা প্রয়োগ করে ঐগুলি দূর করাই হল হোমিওপ্যাথির লক্ষ্য। এই জন্যই হোমিওপ্যাথিতে রোগের কোন বিশেষ নামকরণ করা হয় না।

এই পৃথিবীর কোন দুটি ব্যক্তি হুবহু একরকম নয় কাজেই তাদের বিকৃত জীবনীশক্তি কখনই একরকম লক্ষণাবলী প্রকাশ করে না। প্রায়শই তথাকথিত একই নামবিশিষ্ট রোগের জন্য দুই ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা ওষুধের প্রয়োজন হয়। আবার একই ওষুধ দুই বা ততোধিক রোগের জন্য প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই হোমিওপ্যাথিতে 'রোগের চিকিৎসার বদলে রুগীর চিকিৎসা' করা হয়। যেমন টাইফয়েড বা অ্যাজমার চিকিৎসা না করে তথাকথিত ঐ রোগগ্রস্থ বিভিন্ন রুগীর বিভিন্ন লক্ষণের (মানসিক লক্ষণসহ) ক্ষেত্রে বিভিন্ন ওষুধ প্রয়োগ করা হয়। জটিল তত্ত্ব আউড়ে রোগের বিশাল বিশাল নামকরণ করে রোগ সারাতে নাপারলে লাভ কি? হোমিওপ্যাথিতে রোগের মূল কারণ দূরীভূত হয় বলে ভবিষ্যৎ রোগের হাত থেকেও মানুষ পরিত্রাণ পেয়ে সুস্থ শরীরে জীবনধারণ করে। অর্থাৎ

'Homeopathy can prevent future diseases' অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় রুগীর নানা অসুবিধাকর অনুভূতি দেখা দিয়েছে (functional disturbance)। এই সময় Laboratory report সব Negative Allopathy এসময় অসহায়। এর বেশ কিছু সময় পরে যখন Organic change ধরা পড়ে (Pathological report) তখন অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দেয় বা সার্জারীর আশ্রয় নেয়। অথচ প্রথমেই হোমিও ওষুধ প্রয়োগে রোগ ঐ অবস্থায় পৌঁছাতে পারে না।

অবশ্যই হোমিওপ্যাথি হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা পদ্ধতি। কারণ এর ভিত্তি একটি প্রাকৃতিক নিয়ম আর তাই সার্বজনীন এবং স্থির। তাছাড়া সূক্ষ্মভাবে ওষুধ প্রয়োগের ফলে ওষুধজ রোগের আশঙ্কাও নেই।

পক্ষান্তরে এলোপ্যাথি কোন প্রাকৃতিক সূত্র বা স্থির নিয়ম মেনে চলে না। কখনও বিসদৃশ, কখনও সদৃশ আবার কখনও বিপরীত গুণসম্পন্ন ওষুধ প্রয়োগ করে। রোগের কারণ হিসাবে আজ যা বলা হচ্ছে কালই তা পরিত্যক্ত হচ্ছে। আজকের 'বিস্ময় ওষুধ' কাল ব্যর্থ হচ্ছে। নতুন আরও শক্তিশালী ওষুধ আবিষ্কারের প্রয়োজন হচ্ছে। যা আবার কিছুদিন পরে ব্যর্থ হচ্ছে এবং একেই বৈজ্ঞানিক প্রগতি বলা হচ্ছে। হাজার হাজার গবেষক পন্ডশ্রম করছে এবং ওষুধের দাম আকাশচুম্বী হচ্ছে। বিভিন্ন প্যাথলজিকাল রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে গন্ডায় গন্ডায় বিশেষজ্ঞ দেখানোর খরচ যেখানে অনেক ক্ষেত্রে রুগী বুঝতেই পারছে না তার প্রকৃত চিকিৎক কে? চিকিৎসা পেশার সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিরা একে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং চিকিৎসকরা পরিণত হয়েছেন 'জনগণের ওষুধের' বদলে 'ব্যবসার ওষুধ' বিক্রির প্রতিনিধিতে। রোগের বিশেষ নামকরণ করে বিশেষ ওষুধ প্রযুক্ত হচ্ছে (specific drug for a specific disease)। জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গী - রক্তাল্পতা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ইত্যাদি অসুস্থতার কারণ ধরার ফলে প্রচুর পরিমাণে বহু ওষুধ ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে ওষুধজ রোগের সৃষ্টি হয়ে চিকিৎসা আরও দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে।

অবশ্য কখনও কখনও হোমিওপ্যাথিতে ল্যাবরেটরী রিপোর্টের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে তা রোগের কারণ নির্দেশ করে না। রোগের গভীরতা বা organic change বা রুগীর উন্নতি বা অবনতি (prognosis of the disease) জানার জন্যই রিপোর্ট নেওয়া হয়।

Organon এ হ্যানিমান নিজে বলেছেন যে দুর্ঘটনা বা আচম্বিতে বাহ্যিক কারণে আপৎকালীন অবস্থা (বা রোগ নয়) সৃষ্টি হলে—যেমন বিষক্রিয়া, ভয়ংকরভাবে আগুনে পুড়ে যাওয়া এরূপ ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ উপশমকারী ব্যবস্থা—অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ, অক্সিজেন স্যালাইন ইত্যাদি নিতে হবে। পরে জীবনীশক্তি উজ্জীবিত হলে হোমিও ওষুধ দিতে হবে। মাদার টিংচার বা টনিক কখনই হোমিও ওষুধ নয়। আরোগ্য অসম্ভব হলে সেক্ষেত্রে একমাত্র উপশমকারী হিসাবে এগুলির ব্যবহার চলতে পারে। প্রকৃতপক্ষে অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি বা আয়ুর্বেদ ওষুধের মূল উৎস একই। কিন্তু এটা বুঝতে হবে যে একমাত্র সদৃশ বিধানে (Similar symptoms) সূক্ষ্মভাবে ওষুধ দিলে তবেই সেটা হোমিওপ্যাথি।

কিছু হোমিওপ্যাথ আজকাল সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর (deep acting) একাধিক ওষুধ একই সময়ে একই রোগীর উপর দিনের পর দিন বা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুবার ব্যবহার করেন। অ্যালোপ্যাথদের মত একটি বা দুটি লক্ষণের জন্য একটি বা দুটি ওষুধ ব্যবহার করেন। বারবার একই ওষুধ ব্যবহারে এক্ষেত্রেও ওষুধজ রোগের সৃষ্টি হয়। তাঁদের যুক্তি বহুদিন পূর্বে প্রবর্তিত হ্যানিম্যানের নিয়মগুলির আধুনিকীকরণের প্রয়োজন।

আমার প্রশ্ন— সময়ের ব্যবধানে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম কি পালটে যায়? নিউটনের গতিসূত্র বা মহাকর্ষ সূত্র কি পালটে গেছে।? গবেষণার প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। সভ্যতার কুফল হিসাবে যে নতুন নতুন রোগ লক্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে তাদের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য আমাদের অস্ত্রাগারে নতুন ওষুধ বার করার প্রয়োজনীয়তা আছে। তবে সেটা মূল নিয়মগুলি মেনেই করতে হবে।

শিক্ষিত সম্প্রদায় ভেবে দেখুন— যে জীবাণুবাদ আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের গর্ব তা কতটা সত্যি। এই সব জীবাণু যদি সত্যিই এত শত্রুভাবাপন্ন হত তবে কি আমরা বেঁচে থাকতে পারতাম? প্রাণসৃষ্টির আদিকাল থেকেই এরা

আছে এবং এদের সঙ্গে সর্বদা মেলামেশা করেও তো আমরা সবাই অসুস্থ হই না। তাছাড়া ইচ্ছা থাকলেও এদের আমরা কোন সময়েই ধ্বংস করতে পারব না। যত শক্তিশালী ওষুধই আবিষ্কার করি জীনগত পরিবর্তন সাধন করে এরা ঠিক টিকে থাকবে। তাই আমরা দেখি ম্যালেরিয়া, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি নির্মূল বলে দাবী করা সত্ত্বেও কিছুদিন পরেই আবার এরা দেখা দেয়। সুস্থ জীবানীশক্তি এইসব জীবাণুর সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করে। আগে জীবনীশক্তি অসুস্থ হয়। তখনই এইসব জীবাণুর আক্রমণে আমরা কাবু হই। আমরা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি ষড় রিপুর অধীন। এইসব রিপুর কোনটি বা একাধিক প্রবল হবার ফলে আমাদের নানা অনাচারের জন্যই জীবনীশক্তি অসুস্থ হয়। কাজেই আমাদের অসুস্থতার জন্য বাইরের জীবাণুকে দায়ী করলে চলবে কেন? হোমিওপ্যাথির সূক্ষ্ম মাত্রা এই তত্ত্ব মানার পক্ষে যত অনর্থের সৃষ্টি করছে। কিন্তু এটা জড় বিজ্ঞানের অক্ষমতা না সূক্ষ্ম মাত্রার অপরাধ? কর্মক্ষেত্রে হোমিওপ্যাথি নিত্য প্রমাণিত। তার সত্যতা সম্বন্ধে এর থেকে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

ওষুধ নির্বাচনে সমধার্মিক লক্ষণ সমষ্টির সংগ্রহ মোটেই সহজ নয়। দক্ষ চিত্রকর যেমন তুলির সামান্য কয়েকটি টানে কোন ব্যক্তিত্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন তেমনি কোন লক্ষণটি প্রয়োজনীয় বা গুরুত্বপূর্ণ, কোন লক্ষণটির অর্থ কি ভাবে গ্রহণ করা উচিত যে সম্বন্ধে সূক্ষ্মদৃষ্টি অর্জন করতে হলে যে গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় তার জন্য চাই আন্তরিক নিষ্ঠা ও সাধনা।

পরিশেষে কয়েকটি তথ্য। দেশে বিদেশে বিখ্যাত হোমিওপ্যাথরা অধিকাংশই লব্ধপ্রতিষ্ঠ অ্যালোপ্যাথ ছিলেন। ঐ চিকিৎসায় বীতশ্রদ্ধ হয়েই তাঁরা হোমিওপ্যাথ হন। ভারতবর্ষে হোমিও চিকিৎসার ভগীরথ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার অ্যালোপ্যাথিতে M.D. ডিগ্রীধারী। ভারতে বিজ্ঞান চর্চারও অন্যতম পথিকৃৎ তিনি। তাঁর একক চেষ্টায় প্রকাশিত হয় 'Calcutta Journal of medicine', তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন 'Indian Association for the Cultivation of Science', ১৮৬৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী British Medical Association-এর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি পাঠ করলেন এক যুগান্তকারী প্রবন্ধ যাতে তিনি প্রচলিত বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসার নিন্দা এবং হোমিওপ্যাথির গুণগান করলেন। প্রত্যেকে একযোগে তীব্র ভাষায় ডাঃ সরকারকে আক্রমণ করলেন এবং তাঁকে বর্জন করলেন। তাঁর পশার কিছুদিনের জন্য মাটি হয়ে গেল—ছয় মাসের মধ্যে তিনি একটিও রুগী পেলেন না। নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের ফলে শেষ অবধি তিনি জয়কে করলেন করায়ত্ত। চিকিৎসকদের মধ্যে তিনিই প্রথম কলকাতার শেরিফ (১৮৮৭) হন। একে একে তিনি হন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো (১৮৭০), পরপর চারবার Bengal Legislative Council-এর সদস্য, সাম্মানিক D.L. ডিগ্রী (১৮৯৮), ইংল্যান্ড ও আমেরিকার হোমিওপ্যাথিক কারেসপনডিং মেম্বার এবং দেশ বিদেশের নানা সম্মানে ভূষিত হন। তাঁর জীবদ্দশাতেই স্থাপিত হয় 'Calcutta Homeopathic College'।

১৯৭৩ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তরের আওতাভুক্ত হয় হোমিওপ্যাথি। বর্তমানে স্বাস্থ্য দফতরের দুটি বিভাগ।

(1) Allopathy

(2) Indian System of Medicine & Homoeopathy (a) Ayurveda (b) Unani

হোমিও ক্ষেত্রে ডিগ্রী প্রদানকারী Central Council of Homeopathy (C.C.H) যার W.B. শাখা Council of Homeopathic Medicine, W.B.। বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত National Institute of Homeopathy, M.D. ডিগ্রী দেয়।

THE FIRST DAY OF MY COLLEGE

SK. SAMIUL HAQUE, XII, Commerce

It was a sunny morning and the first day of my college life. I woke up brushed and shaved before getting prepared for College. My parents awared me of the do's and don'ts of college life, so did my teachers and relatives. I went to College spraying perfume, wearing a new T-Shirt and Jeans with matched shoes and watch. At that time, like most other students I also feld a charm and thought above the Colleges that are usally shown on Television and Hindi Films. I went to College on my Cycle which I had cleaned previously. Entering the College gate my mind filled with a little fear, a little shame and a little hit of loneliness. Then I entered the class room and sat on the fourth bench. There were hundreds of students in a single room. I felt as tonished as I had never seen such a big class room like this ever before. In our school there were thirty to fourty students in a room. Beside me there sat a dark boy whom I asked where he come from. He said he come from Amtala. I told him our College is just ten minutes walking distance from my home. We talked bout our school and school metar, near and there ones etc. After some time a man come and stod beside me. He was so tall with his face full of beard that I thought he must be a teacher and funny thing is I stood up and said "Good morning Sir". He laughed and said that he was not a Sir but a pupil like us. We all laughed at my mistake. We kept on talking while a sir entered our class room. We all stood up and wished him. He brought some senior students and some of the students of our union. Then there was a fun game about calling any students from us and asking him or her a tricky question. We all enjoyed that game. I still remember that one of us was told 'matithe shatar kete dekhoo' he said that his dress would be come dirty while another said that he would write 'shatar' on the ground and then scratch it. Thus he gave the right answer. Like this there were many funny question which some answered and some could not. after that every one was given a rose and a pen. I maid many new friends. Today, some of them still my good friends while some are lost. I went with my friends to the canteen. Then we all had tea. Thus in this way with fun, frolic and laughter, I started my colourful College life.

SEX EDUCATION

Bhaskar Sarkar, 1st Year, English Hons.

Most modern parants concede the value of sex education.They admit they were ignorant,unprepared through childhood and adolescence and regret that they remained in the dark often up to the time of marriage or even after that, most of them now want their wards to be better informed.

A sharp controversy her raged up on the issue of including sex education in the syllabus.Much of the anxiety generated by the prospect is linked to the teacher's own uneasiness with the subject .To worsen, 'sex talk' has always been quated with 'dirty' talk because much of it takes place in single sex group,often in hotels with participants sharing there fascination "ignorance,"and "(mis) information" regarding sex pornography and general love.

Apprehension about sex education is based on the narrow perception of sex as that which culminates in reproductive "intercourse". Recognising human sexuality as something related to but separate from the business of reproduction and helping childern to relateto there own sexuality appears more necessary than giving them the technical details of how babies are born.

As far as sexual intercourse itself is concerned, most psychologists agree that it is wrong suggest that anatomical sex differences and sexual act itself solely for marking babies. Man's biological urge seeks deliverance through its 'sex act' which very essentially communicates the warmth of adult physical love. (Sex itself is not bad, it is as sanctified as religion). Many young people are emotionally disturbed because they sometimes find themselves thinking about sex. They are torn between their emerging sexual ardour and the restraint of society.

Any kind of formal sex education should take place before puberty, when children are nine or ten. Parents are of course the best persons to judge their child's readiness to face facts. The main thing is that parent's responses to a child's discovery of his or her sexuality must not convey the message that certain parts of the human body are dirty or that one should be shameful, that there is something wrong with the pleasure that emanates from those parts. For instances, the first question parents have to deal with is how to respond to masturbation. Research and sex surveys attest to the normal, even beneficial nature of masturbation. Psychologists say that children should know about matters like menstruation and natural emission before they happen so that they are prepared and not traumatised.

Helping children prepare for happy, healthy, responsible sex lives means giving up sexual stereotypes. Today's daughters are unlikely to find emotional fulfillment if today's sons are not raised to provide it. A mis-match is fated for women and men in the future if girls continue to be programmed for romance without sex and boys for sex without emotion.

Financial Frauds and Market Crashes: Casino Capitalism Indian-style

Pranam Dhar*

A. Introduction:

When India's Finance Minister Yashwant Sinha presented the Union Budget on February 28, 2001, there was an overwhelming positive response from the financial markets. Lauded as a "dream budget" by foreign investors and big business lobbies because it favored their interests, the Sensex (the index of Bombay Stock Exchange), also popularity known as the barometer of the Indian economy, jumped 177 points. The next day too, the sensex rose 24 points. However, the very next day (March 2, 2001), the Sensex crashed 176 points. Thereafter, the Sensex continued its southward journey because of heavy panic selling. Within a week, the Sensex lost over 700 points and more than 500 of the 1364 actively traded shares touched 52-week lows. In the entire month of March 2001, a total wealth of nearly Rs.1460000 million (approximately US$32 billion) was wiped out in market capitalization, more than Rs. 45000 million a day.

The immediate fallout of market crash in Bombay was so widespread that shock waves were also felt in Calcutta and other financial centers. The payment crisis broke out in the Calcutta Stock Exchange (CSE) with nearly 100 brokers unable to meet payment obligations. Later, all broker-directors of the CSE governing board resigned. At one point, the suggestion to shut down the CSE was also considered. Further, Anand Rathi, President of the Bombay Stock Exchange (BSE) had to resign following serious allegations that he misused his position to access sensitive information about the market exposure of certain big players.

The market meltdown also took toll of the banking sector when Ahmedabad-based cooperative bank, Madhavpura Mercantile Cooperative Bank (MMCB), faced a run on its deposits because of heavy exposure to the stock markets. The bank is now on the verge of liquidation,. The nexus of this bank with the big bull, Ketan Parekh, is yet to be unraveled completely, but recent disclosures suggest that MMCB had a big exposure to stock market through Ketan Parekh. The bank, in collusion with Ketan Parekh, issued pay orders, (an order, backed by cash or deposit, issued by a bank to pay any third party on behalf of a client), without the backing of sufficient funds. Ketan Parekh, in turn, used this money to rig up the prices of shares. This nexus went unnoticed for almost a year but was broken when MCCB failed to honor the pay orders that it had issued. It has been estimated that Parekh and his front companies siphoned off nearly Rs. 8000 million from the bank. The immediate falloutof this fraud has been on the leading commercial banks such as Bank of India, State Bank of India and Punjab National Bank which have suffered huge losses on account of pay order fraud. Besides, over 300 cooperative banks in the state of Gujarat have also burnt their fingers in overnight exposure to the MCCB. According to recent estimates of India's central bank, the Reserve Bank of India (RBI),the total banking sector's loss in the entire fraud would be closure to Rs. 12000 million.

Perhaps the most horrific impact of the roller coaster was on small investors and sub-brokers who committed suicide after suffering

* Lecturer in Commerce, Vivekananda College, Kol-63

huge losses in the crash. The crash has so far claimed more than eight lives. Not only the supporters of market-friendly budget, even the critics had never expected that the "dream budget" (which was expected to do wonders for the economy) would turn into a "nightmare" on financial markets within a span of two days. A number of market analysts have rightly called this turmoil the first "Black Friday" of the millennium.

B. Why did the financial market crash?

One cannot blame the political instability or weekening of economic fundamentals for this market crash because there was no marked developments on these fronts in two days. Even the Armsgate scandal *A La* Tahelka.Com expose broke after ten days of financial crash. To understand this sudden market crash, let me briefly explain the two main forces that operate and dominate Indian financial market. This will be helpful to those readers who are not familiar with the jargons and working of financial markets. Popularly known as bulls and bears, these two sets of operators often form a cartel, manipulate the prices of the shares and influence the movements of indices in the financial market.

Bulls increase prices by buying selective shares aggressively in order to sell them at high prices on a later date. The bears usually consist of fewer player (as compared to bull which are usually very large in numbers.) and therefore, can better act in tandem. The bear cartel operates on "short selling" which simply means that they sell borrowed shares (without owning them) in the expectation that their prices will further fall before these shares are purchased and returned. Therefore, their profits are depended on fall in the markets and erosion of share value. To engineer the fall in the financial markets, a number of strategies (including rumors) are used to create panic in the market and to erode investor's confidence.

The market turmoil was the handiwork of an international bear cartel, (in collusion with a few domestic big players) which successfully rigged share prices with impunity. Some of the members of this bear cartel are leading foreign institutional investors (FIIs) and domestic big players such as JM Morgan Stanley Credit Suisse First Boston, First Global, C Makertich, Nirmal Bang and R Damani. The price rigging by international bear cartel was carried out with the full connivance of senior officials of the BSF, including its President. As mentioned above, Anand Rathi, the then President of BSF, misused his official position to obtain sensitive information about the market exposure of bulls, in particular Ketan Parekh and his cronies, and passed it on the bear cartel. Taking undue advantage of lack of liquidity in the markets, the international bear cartel resorted to heavy short selling.

C. The rise and rise of a big bull

Any understanding of the current market turmoil would remain incomplete without analyzing the sudden rise of a big bull, Ketan Parekh, in the financial markets. Popularly known as "New Economy Superman" and "ICE Superman," (ICE stands for Information, Communication and Entertainment sectors), Ketan Parekh was the major player behind the recent boon in the "new economy" stocks. Although Ketan Parekh came to public notice only 1999, his over arching influence in the financial markets could be gauged from the fact that his favorite stocks were known as "K P Stocks" and market players had more faith in the "K P Index" rather than the sensex.

Parekh used to operate through a strong network of over 50 brokers and average daily turn over was estimated to be Rs. 4000 million, almost equivalent to the entire turnover of Amedabad Stock Exchange, one of the leading stock exchanges in the country. It would not be an exaggeration to state that the financial markets danced to the tune of Ketan Parekh, who is still in his thrities. Herds of investors and fund managers (both domestic and foreign) blindly aped the bull run sphere headed by Parekh. Even a rumor linking Parekh's involvement in a particular company led to steep hike in the share prices of that company.

Rather than making investments by rational choice and analysis (such as price/earning ratio, fundamentals of the company, profit-

ability, cash flow, etc), investors blindly follow the investments strategies of Parekh. For instance, if Parekh bought 1000 shares of a company, others bought 10000 shares of the same company to the expectation of making a killing. This is despite the fact that investors were aware that the share prices were unrealistic. A perfect example of hard behavior, an endemic problem facing the financial markets.

The market had such a blind faith in the "genius" of Parekh that his role in several fraudulent deals was overlooked. Very often, he would collude with the top management of companies (e.g., Himachal Futuristic Communications Limited) to drive up share prices to unrealistic levels. The latest controversy is related to his seminal role in the rigging of share prices of a private bank, Global Trust Bank (GTB). It has been alleged that Ketan Parekh and his cronies rigged the share prices of the GTB prior to its merger with the UTI Bank, in order to improve the swap ratio in favor of GTB. With Parekh and his cronies being the major traders, the share price of GTB rose from Rs. 70 in October 2000 to Rs. 117 within three weeks. It is only now when the bank merger had already been announced that investigations have been launched to look into Ketan Parekh's role in insider trading. The interim investigations carried out by India's regulatory authority, Securities and Exchange Board of India (SEBI) found "evidence of a nexus" between Ketan Parekh and Ramesh Gelli, promoter of GTB.

D. The games bulls and bears play

Due to various factors including the bursting of "New Economy" bubble and the subsequent downward trend in NASDAQ, Ketan Parekh and his cronies started borrowing heavily. The only option before Ketan Parekh and other member of the bull cartel was to recklessly rig the prices of shares upwards and then sell them. Initially, he and his cronies borrowed heavily from the banks but later switched to unofficial markets in Calcutta. Over 90 per cent of transactions in Calcutta are estimated to be unofficial, outside the exchange with no records and margin money. The financiers at Calcutta were too happy to lend huge amount of money to Parekh and his cartel at rates as high as 100 per cent.

Because of liquidity crunch, Parekh and his cronies were finding it extremely difficult to further push the prices of stocks upwards. Taking advantage of this situation, the international bear cartel got together and started massive selling of "KP Stocks" in the hope of buying them dirt-cheap at a later stage. The short selling was carried out with the active connivance of Anand Rathi and other broker-directors of the BSE who provided sensitive information to the bear cartel about market exposure of Parekh and his cronies. The sudden selling of shares created a panic-like situation in the markets. Sensing a major meltdown, the big market players not associated with the bear cartel also started heavy selling of "KP Stocks." Even the Madhavpura Cooperative Bank started offloading the shares it held as collateral from Parekh, fearing his inability to pay back the borrowed funds. All these factors further contributed towards the steep decline of the prices of "KP Stocks."

Some of "KP Stocks" lost nearly 90 per cent of their value since their peaks early last year. For instance, the share of Zee dropped from its peak of Rs. 2230 to Rs. 127 while the share of Himachal Futuristic Communications Limited was traded at Rs. 194 on March 14, 2001, many times lower than its peak of Rs. 2553. The share price of DSQ which Parekh jacked up to Rs. 2820 only a few months ago, came down to Rs. 127 on March 14. Because of tough hammering of "KP Stocks" by the international bear cartel, several associates of Parekh, particularly those located in Calcutta, defaulted on payment obligations estimated to be more thanRs. 10000 million. Taking advantage of the low prices of shares, several TNCs turned this crisis into an opportunity. TNCs such as Sandvik Asia, Cabot India, Hoganas India and Centak Chemicals enhanced their stakes by buying their own shares at dirt-cheap prices.

E. The official response: bolting the stable doors after the horses have felt

Smelling deliberate price rigging, the Ministry of Finance asked the SEBI to launch investiga-

tions into the matter. The SEBI is investigating the books of some 20 big players to find out whether unwarranted deals were carried out. As the news of higher exposure of private banks and cooperative banks to stock markets came to light, the RBI also initiated parallel investigations.

After the market crash, the SEBI has launched a series of measures to halt the decline in the financial markets. Some of the measures are listed below.

1. All brokers acting as directors and other office bearers of the Bombay Stock Exchange have been suspended for alleged insider trading. In order to prevent misuse of sensitive information by broker-directors, stock markets will be corporatized soon.
2. To contain volatility, SEBI has imposed an additional 10 per cent volatility margins on all the A Group shares and additional margins on stocks in Automated Lending and Borrowing Mechanism (ALBM) and Borrowing and Lending of Securities Scheme (BLESS).
3. The SEBI has also imposed volatility margins on net outstanding sale positions of FIIs, financial institutions, banks and mutual funds.
4. On March 8, 2001, the SEBI banned naked short sales. In simple words, it means that all short sales have to be covered by an equal amount of long purchases.
5. Cutting gross exposure limit for brokers to 10 times the base capital in the case of National Stock Exchange (NSE) and to 15 times in case of other stock exchanges.
6. Rolling settlements (which ensures that the settlement takes place five days after trading) will now be compulsory.
7. In order to increase liquidity, SEBI has allowed banks to offer collateralized lending only through BSE and NSE.
8. Launching of trade guarantee fund to guarantee all transactions.

F. Never ending stories of financial frauds and market crashes in India

One welcomes some of the new measures announced by the SEBI to arrest the abnormal fall in the financial markets, but this is not the first time that unscrupulous traders and cartels have manipulated the Indian markets in their favor. Since the liberalization and globalization of Indian economy commenced in 1991, the country has witnessed at least a dozen major white-collar crimes and frauds in the financial sector. Despite the establishment of regulatory authorities such as the SEBI, financial frauds are recurring at regular intervals. On an average India has witnessed major financial frauds every year through out the nineties.

There is a whole history of frauds in the financial markets from the famous securities scam of 1992. Handiwork of the then big bull Harshad Mehta, this scam unearth the systemic problem facing Indian financial markets. When the scam was exposed Sensex suffered a decline of 570 points on April 28, 1992. This was the steepest decline in the recent history of the Indian financial markets. Then came the Preferential Allotment fraud in 1993, in which many transnational corporations (TNCs) allotted shares to themselves at prices way below the prevailing market ones. It has been estimated that these TNCs profited to the tune of Rs. 50000 million. The credit for alloying this fraud should go to the then Financial Minister, Manmohon Singh. Eager to quickly deregulate and liberalize the Indian economy, Singh abolished with one stroke the Controller of Capital Issues (the official body which used to regulate capital issues and pricing) in June 1992. When the media exposed the disastrous consequences of removing these controls SEBI had to re-regulate the preferential pricing norms. But by the time SEBI took action, TNCs had already made a killing by issuing shares to themselves at throwaway prices.

Between 1992 and 1996 the country witnessed the Primary Market Fraud, also popularly known as Vanishing Companies Fraud. In the absence of strict guidelines and regulations, fly-by-night operators floated as many as 4069 public issues and collected over Rs. 450000 million from the public on fictitious grounds. After raising the money, these operators vanished with the money. It was well after two years that SEBI took notice of this fraud. Still, several vanished companies are yet to be identified and prosecuted.

In the mid 1990s, the country also witnessed the Plantation Companies fraud when dubious investment companies raised nearly Rs. 500000 million from the public for plantation schemes. After convincing the investors that money grows on trees, promoters vanished with the money. Then came the Non-Banking Financial Companies fraud, in which small investors were duped by fly-by-night financial companies after promising higher returns on fixed deposits. In this case by the time the regulatory authority got into action belatedly, unscrupulous operators had already fled.

In 1998, Indian financial market were rocked by massive share price rigging fraud involving reputed industrial groups such as BPL, Sterlite and Videocon. No punitive action has been taken so far by SEBI against the main offenders, which include Harshad Mehta and the top officials of these companies. On October 5, 1998, the Sensex recorded a sizeable fall of 224 points when an International institutional investor, Morgan Stanley, in tandem with an International bear cartel resorted to heavy short selling. The attack by the bear cartel was unleashed on those stocks in which the Government owned Unit Trust of India had made substantial investments. This day is also known as "Black Monday" in the Indian financial markets. Although SEBI had promised to investigate the crash, still no one has any clue regarding the actions taken against Morgan Stanley and the bear cartel.

In 1999, the country was under the grip of information technology mania. In order to dupe ordinary investors, a large number of private companies overnight changed their names to dotcom. For instance Oriental Paper Limited changed its name to Oriental Software Limited and Aftek Business Machines changed its name to Aftek Infosys. After jacking up the price of shares of their companies, the promoters vanished. The latest fraud linked to Cyberspace Infosys Limited. For instance, after changing the name of Century Finance to Cyberspace Infosys Limited and thereby manipulating the prices of the shares, the "politicaly well-connected" promoter Arvind Johri, vanished from the country alongwith the money leaving behind dozens of anguished employees and hordes of innocent small investors.

Likewise, the financial marjet were in a serious panic on April 3, 2000, when the Sensex lost 361 points following the Income Tax notices served on several FIIs operating in Indian financial markets. As a result nearly, Rs. 600000 million (approximately US$13 billion) were lost in the bloodbath. This was the second biggest single-day market crash. These FIIs were routing their investments through Mauritius in order to benefit from the Indo-Mauritius Double Taxation Treaty. After accusing the fly-by-night operators for this crash and declaring that India is not a "Banana Republic", the Financial Minister buckled down the very next day and cancelled the Income Notices issued to the FIIS. It is also an open secret that several Mauritius based corporate entities with huge amount of money operate sub-accounts of FIIs working in India. These corporate entities use FIIs to re-route illegal Indian money back to the country. Many these sub-accounts are actively involved in price rigging by bulls and bears.

G. Regulation: too little and too late

All the above mentioned instances of frauds and manipulations reveal the week regulatory and supervisory framework in India. It also points out the lax attitude of the regulatory authorities to prevent such frauds. The surveillance system of regulatory authorities is in such a bad state that they had absolutely no clue while the frauds were being committed.

Unfortunately, in most of the instances, the response of the regulatory agencies has been reactive rather than proactive. Like popular Indian movies, the regulatory agencies came into the picture when the damage had already been done. This is despite the fact that regulatory authorities have an armory of instruments at their disposal to prevent such frauds. According to L C Gupta, Former member of SEBI Board, even when actions are taken, they are generally ad hoc in nature. Because of these reasons, there is a growing feeling that the regulatory authorities, particularly the SEBI, tend to protect the interests of big players rather than small investors.

It is common knowledge that there are

not only bear cartels but also cartels playing their games in the Indian financial markets. Why SEBI has not taken any action against such cartels in the past? What about insider trading, which is so rampant in the Indian markets? What about circular trading (a group of brokers buy and sell shares to generate volumes in specific stocks basically to lure other investors) so prevalent in the Indian markets? Why the proposal for uniform settlement cycle across different exchanges has not been implemented for the past five years? Why didn't SEBI lake early action to prevent the nexus of the brokers and directors running the stock exchanges? Why SEBI has not taken any action regarding the Indian money routed through the FIIs? Why the SEBI tuned a blind eye to the illegal business transactions in Calcutta Stock Exchange? These are some of the questions SEBI has so far not answered.

These questions are not only expose the incompetence of SEBI but also the lack of political will among our policy makers. Although our policy makers are keen to adopt the Anglo-Saxon system of running the domestic financial sector, they have ignored the fact that such financial frauds would have attracted tough punitive measures even in the so-called "free market" economies such as the US and Hong Kong. In these countries, insider trading and short selling are serious offences. Further, there is a speedy investigation mechanism in place and the culprits are quickly booked. Not long ago, the junk bond trader Michael Milken spent several years in jail besides paying nearly $1 billion in penalties. Further, he was debarred from entering stock markets for the whole life. The notorius manipulator, Ivan Boesky, was also jailed for his involvment in insider trading. Likewise, two financial journalists were jailed in the US for 18 years on the charge of insider trading.

On the contrary, the situation in India is completely different. Scamsters and fraudsters are well-respected public figures in India, whose advice is frequently sought by financial markets and the media. Instead of spending their lifetime in jail, scamsters lead a lavish lifestyle and write newspaper columns. The cases against Harshad Mehta and his associates in the securities scam of 1992 are still pending in the court. Almost ten years have passed, still no one has any clue when these culprits will finally be punished.

H. What ails Indian financial markets?

Despite the growing integration of Indian financial markets with the global markets along with the introduction of sophisticated investment instruments and electronic trading, the financial markets in India are highly inefficient and are frequently manipulated by a handful of rogue traders. A nexus consisting of big institutional investor-businessman-banker-official-politician is powerful enough to manipulate the financial markets to its advantage. While the small retails investor is always a loser in market manipulations. The retail investor only enters the financial markets when the share prices are either at peak or the bull run is over. Before the retail investor could understand the games played by big bulls and bears, big operators move out and the prices collapse. Unfortunately, the small investor ends up as the only long player in the Indian financial markets. Various attempts by the government to encourage small investors to return to financial markets are not going to yield positive results until and unless the Indian authorities ensure that savings of small investors will not be held to ransom by a Handful of unscrupulous big operators and manipulators.

Due to frequent market manipulations and frauds, the retail market has almost been wiped out in India thereby providing more leeway to big operators and institutional fund managers. Except a few big operators and domestic institutional investors such as the UTI, the Indian financial markets are dominated by the FIIs. Although there are over 500 FIIs registered in India, only top 5 FIIs contribute over 40 per cent of the total portfolio investments. Instead of taming such volatile and speculative investments, the successive governments in India have been continuously relaxing controls and regulations in order to increase their hold over the Indian markets. The latest "dream budget" also offers several new incentives to FIIs such as cuts in divided tax and capital gains tax besides allowing FIIs to acquire up to 49

per cent of equity of any Indian company. Instead of learning lessons from the Mexican and the Southeast Asian financial crisis, and consequently adopting policy measures to avert a similar crisis in the country, the successive governments in India in the nineties have been recklessly liberalizing existing regulations on such volatile private capital flows.

In fact, over 90 per cent of total volume of trading in stock market is accounted by hardly 50 shares in India. A year back, when the information technology boom was in full swing, the market capitalization of two Indian software companies, Wipro and Infosys, was more than the entire GDP of Pakistan, estimated to be $55 billion. At that time, the total market capitalization of the BSE alone was nearly 62 per cent of India's GDP.

Some time ago, US Federal Reserve Bank Chairman, Alan Greenspan, used the phrase "irrational exuberance" to explain the excesses of Wall Street. It appears that Indian Financial markets may also qualify for the same, as they have become extremely speculative, volatile and irrational. According to calculations done by L.C. Gupta, the speculative trading in the Indian financial markets is one of the highest in the world. The ratio of trading volume to market capitalization in India is about three times the ratio in the US and UK. The irrational behavior of financial markets can be gauged from the fact that on February 14, 2000, there were no sellers of shares of well-known software company, Infosys, in the entire Indian markets, while the next day, there were no buyers of it. Is there any better term other than "schizophrenia" to explain such irrational behavior?

These facts bring out the sordid state of affairs in the Indian financial markets. There is a serious crisis of confidence in the credibility and competence of SEBI to regulate Indian markets. There is no denying that SEBI needs to be given more powers in terms of search, seizure and imposition of penalties to ensure that fraudsters don't dare to commit frauds. Several proposals to further empower SEBI have been made in the past, but the Ministry of Finance is sitting on these proposals. Apart from adding on to the powers of SEBI, its staff should be entrained in special skills to ensure better market intelligence and surveillance. These becomes much more important in the present context when sophisticated investment tools such as financial derivatives are being introduced in the Indian financial markets.

Besides strengthening the stock markets, policy makers will have to give equal attention to strengthen the banking sector. One of the main reasons behind increased volatility in the financial markets is the private bank lending to traders against shares. Although the public sector banks very little or no exposure, it is the private sector banks such as Global Trust Banks, Standard Chartered and Citibank that have been lending huge money to big operators in the stock market. In an event of massive stock crash, banks with heavy exposure in the stock markets would also be in deep trouble. Therefore, the central bank should further strengthen prudential norms and regulations related to bank lending. Furthermore, with the breaking down of traditional walls between the stock markets and the banking sector, a collapse in stock market can have a devastating effect on the Banking Sector. Therefore, there should be more coordination between the central bank and SEBI to regularly monitor the developments in the financial markets and banking sector. Even the small cooperative banks must come under close scrutiny of the regulatory authorities. By and large, the authorities have adopted a complacent attitude that cooperative banks are too small to be regulated. The prudential norms enforced in commercial banks in the early 1990s were implemented in cooperative banks only in 1999 - 2000. Cooperative banks were established in the country to serve such poor people and small businesses whose needs were ignored by both public sector banks and big private commercial banks. Recent experience, however, shows that some of these banks have gone beyond their original mandate and have diverted money to speculative businesses including stock markets, bullion trade and money markets. The run on the Madhavpura Mercentile Cooperative Bank, followed up by frauds at Classic Cooperative Bank and City Union Bank, reveal the systemic weaknesses in the entire cooperative

banking sector. With a total deposit of Rs. 15000 million, MMCB was the second largest cooperative bank in the state of Gujarat. By offering higher interest rates, this bank was able to raise deposits amounting to Rs. 5000 million from small cooperative banks in the state. In order to prevent the spill over effect of the default on the entire payments system, the central bank quickly took over the MMCB. Since the problems are more systemic, the regulation of the entire cooperative banking sector needs to be strengthened by the central bank.

I. Concluding remarks

To conclude, the need of the hour is complete overhauling of the entire financial system, which resembles a casino in which assets are traded primarily for speculative profit rather than for the benefit of the real economy. Rather than serving the interests of people at large, the financial casino serves the interests of a handful of speculators, financiers and manipulators. The financial casino is worse than an ordinary casino in the sense that the players in an ordinary casino follow certain rules. It is the financial casino that perpetuates market crashes thereby adversely affecting millions of ordinary investors who have put their savings and assets at its disposal. Even those who are not part of financial casino (such as workers, farmers and small traders) and who would not like their savings to be put into this casino, are involuntarily being made to play in this casino because it affects savings, investments, exchange rates and interest rates.

Unfortunately, the successive governments in India have been promoting the financial casino as part of financial sector reforms prescribed by the IMF and the World Bank. Whereas, India's financial system has been predominantly bank-based and more suited to local conditions. The banks have played a major role in the industrial and agricultural development of the country. Despite the fact that the banks have been the largest mobilizers of household savings, Indian authorities are determined to transform the entire financial system into a financial markets-based one. Various fiscal incentives and concessions are being offered to savers to divert their savings away from the banks to the financial markets. Efforts to promote financial markets at the cost of banks would proof counterproductive to the entire financial sector as well as the real economy. Since the Government has promised to make public the investigation reports of SEBI and RBI on the current market melt down, these reports are eagerly awaited. But the moot question is: what would be the fate of these reports? Would these reports also gather dust like the previous reports? Would time-bound punitive actions be initiated against greedy manipulators and rogue traders who are bent upon destroying not only the financial markets but also the entire macro economy?

References:

1. Zicom is a good medium to long term buy – Sanjay Chhabria
2. Recovery of NIFTY and Sensex from their short-term trend on Friday has given some hope to the bulls-JRG Associates
3. Investors can buy Panchmahal Steel at the current levels – Ashish Chugh
4. Successful long-term investing revolves around identifying themes or trends – Arun Jethmalani
5. The best potential lies in the good issues from unlisted medium-sized companies – Anil Joneja
6. Various Daily News Reports of Dalal Street, Economic Times and The Statesman.

The Renaissance in Bengal and its European Precedent

Pranati Dutta Gupta

The European Renaissance first took root in Italy and eventually came to encompass virtually every aspect of Italian culture and ethos. Germany on the other hand witnessed a religious revolution. The English Renaissance despite its late start soon caught up with the rest of Europe. The exposer to the British Nation served as a pivotal force and influence behind the Renaissance in 19th century Bengal. It is one of the paradoxes of history that this 'awakening' should have been spurred by alien and inimical nation. Just as the example of ancient Greek language and literature had inspired the Italians, so also the rich linguistic and literary intellectual tradition of Britain opened up new vistas for intellectually famished Bengali. English learning was the pillar on which the new cultural and intellectual edifice of Bengal came to rest.

A survey however cursory, of the salient events and activities in 19th century Bengal will reveal trends and tendencies, reminiscent of those that marked the transition from middle ages to the Renaissance in Europe. In Europe three centuries ago, the spirit of the Renaissance brought in its train a more worldly outlook and temper (while no attempt was made to dethrone God). The new vision came to embrace a fresh and positive appraisal of man himself - in all his dignity, nobility and perfectibility. Renaissance man ventured to scrutinise, reinterpret and revaluate the inherited tradition. Reason made forays into areas where authority and more specifically religious and clerical authority entailed the rejection of mediation and an assertion of the individual's right to decide his own fate. Individualism was the natural outcome. The human consciousness imbibed a more scientific outlook, a deeper inquisitiveness and a keener sense of history. Thus a more open modern and secular society emerged from amidst a closed and feudal past. Most of these sweeping changes were engendered by two seminal and path breaking events - the discovery of forgotten classical text and the advent of printing press. These is turn fostered the phenomenal rise of classical learning and subsequent promotion and enrichment of vernacular language and literature. One cannot afford to overlook the role of the great humanist who pioneered these changes. The impetus to Bengal Renaissance was analogous, if not identical. In course of their pursuits of excellence and truth, the people of Bengal passed through parallel phases of development under the able leadership and vanguard of our own humanists - and where did our humanists derive their inspiration from ? - largely from the legacy of the European Renaissance that the British had brought over. Englishmen of the 19th century had not moved far from the Renaissance .The Victorian thinkers and men of letters such as Matthew Arnold were constantly seeking to define and redefine their present and future, achievements and objectives in the light of the glorious hellenic past which was to be the very fount of the Renaissance.

The Renaissance in Bengal spanned over practically the entire 19th century, culminating in the Swadeshi Movements of 1905. If it were possible to ascribe specific date to its beginning historians would probably be unanimous in there choice of 1814 the year in which Rajarammohan Roy (1772-1833) arrived in Calcutta on his mission of reformation and enlightenment. Culcutta, needless to say became and remained the seat of diverse activities set in motion by Rammohan and his associates and successors. Rammohan Roy and Iswarchandra VidyaSagar(1820-1891) were the two central figures during the first and most eventful phase of the Renaissance in Bengal. The other stalwarts such as David Hewe, Henry Derozio, Benlinck and Belthune, William Carry among the foreigners and

a host of eminent Bengalis such as Dwarakanath and his son Debendranath Tagore, Akshay Kumar Dutta, Kaliprasanna Sinha, Ramendra Sundar Tribedi and many others who extended their able support in both the humanist and social programmes

The comprehensive vision with which these humanists set about the tasks, made it possible for them to integrate strands as diverse as promotion of education both native and new, social reformation and regeneration and the revival of the inherited faith in its pure and pristine form. Re-interpretation of ancient Hindu Scriptures and shutras was taken up in earnest and justification of the social reforms sought in the same. Ram Mohan was an avowed monotheism. He brought out a Bengali translation of the authoritarian text of the vedanta and five of the principal Upanishads in order to prove to the populace the vindication of monotheism by the Hindu. Scripture themselves. In this way he initiated the Brahmo Movement. Ram Mohan's role in the abolition of the deplorable practice of sati is all too well known. The anti sati act was promulgated by Lord Bentinck under his initiative, in 1829. Iswar Chandra Vidyasagar advanced the programme of social reformation further when he successfully took up causes such as the abolition of child marriage (1850) and polygamy (1871-73), redressing the plight of Hindu widows leading up to the widow marriage act in 1856. Neither Ram Mohan or Vidyasagar was engaged in social reforms exclusively. Their contribution toward the spread of education for both men and women and promotion of vernacular was invaluable. Ram Mohan was actively involved in founding of the celebrated Hindu College in 1817. One may also recall his letter to Lord Amherst dated Dec. 1823 in which he advocated an educational policy-that eventually became the official educational programme. He was responsible for the introduction of English language and secular curriculum at Hindu College. Vidyasagar authored several primers this 'Bengali primer' is well known even to day. As Principal of the Sanskrit College Vidyasagar removed the caste ban partially. His successor E.B. Cowell opened the doors for all Hindus regardless of caste. The young Bengal also took up the cause of education through their organ Parthenon. The same periodical testifies to the groups fascination with ancient Greece and its surrogate modern England.

Other land marks in the intellectual horizon include the establishment of some schools & institutions like Anglo Hindu School, Oriental Seminary, David Hare's school book society, Derozio Academic Association, foundation of Presidency, College Calcutta University. Interest in advancement of science did not lag behind. The arrival of Railways, Steam Engine, Telegraph and the printing press introduced by Willam Cary at Srirampur had already generated considerable enthusiasm. . Medical College was set up in 1835, Calcutta Mechanical Institute in 1839. Mahendra Lal Sarkar founded Indian Association for cultivation of science in 1876. It would be worth while to note Vidyasagar's endeavour in this area. He introduced in his curriculum subjects like Geography, Mathematics and Astronomy. His own book 'JIBAN CHARIT' includes portraits of Galileo, Copernicus and Newton. Bankim Chandra's 'BIGGYAN RAHASYA' covered the gamut of Western scientific knowledge and discoveries.

The close of the first phase is marked by perceptible and palpable change in general outlook and condition. The old order retreated and was supplanted by an altogether new 'Weltausc hauung'. The citadel of obscurantist Brahmins began to crumble just as papacy had gone into retreat at the end of the medieval Europe.

The world view harboured by the Hindu populace (is ignorance of their scriptures) prior to the Renaissance is comparable in the primitiveness with a ptolemic world-view current in medieval Europe. To the Hindus, India was Jambudweep - one of the seven islands, surrounded by seven oceans that constituted the earth. The earth was supposed to be flat and the sun just another planet revolving around it. Glimpse of the older effete order may be found in works of literature such as Tagore's poem 'দেবতার গ্রাস' which is a moving document of the heinous practice of child sacrifice. Bankim Chandra's 'কপালকুণ্ডলা' offers a horrifying account of rite of human sacrifice in general.

Bankim Chandra Chattopadhyay - (1838 - 1894) arrived on the scene at a juncture when the new order was consolidating itself. He is in all respects the quintessential Renaissance Man. He assimilated the whole body of thoughts and ideas that his predecessors had brought into force. His pronouncements on dignity and potential of man, the equality of the sexes and among different classes of society, the glory of Hindu religion,

the richness of Bengali language captured the spirit of the age itself. Mention may be made of essays 'সাম্য', ধর্মতত্ত্ব, বাঙ্গলা ভাষা, মনুষত্ব কি, ধর্ম এবং সাহিত্য. His treatise entitled 'কৃষ্ণ চরিত্র' as its prefatory note outlines is an appraisal of Krishna as a human rather than a divine being "এ গ্রন্থে আমি তাঁহার কেবল মনবচরিত্রেরই সমালোচনা করিব।". Bankim's perception of humanity finds apt expression in 'ধর্মতত্ত্ব' – the essay posits man's cultivation and hernessing of his own potential. :"মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্করণ ও চরিতার্থতায় মনুষত্ব।"

Rammohan and Vidyasagar laid the foundation of Bengali proses prior to the Renaissance vernacular prose had been non-existent. Their are successors built upon this foundation and the Bengali language came of age. Vidyasagar wrote several books including popular tales which eventually became classics of Bengali literature. But it was his younger contemporary Michael Madhusudan Dutta (1824 - 1873) who emerged as a great literary artist innovator. He expanded and extended the potential of his mother language and literature infinitely. His epic 'মেঘনাদবধ কাব্য' shows the influences of Milton in its subrersion of the traditional conception of the hero and the anti-hero. Milton's conscious or unconscious epathy with Satan is echoed by Madhusudan in his professed identification with Ravana and Meghnad. Furthermore it was Madhusudan who introduced blankverse and the sonnet to Bengali literature. His 'কৃষ্ণ কুমারী' is the first five-act tragedy in Bengali and his 'বীরাঙ্গনা কাব্য' is modelled on Horacain epistles. His immortal sonnet বঙ্গ ভাষা beens testimony to his deep attachment for the Bengali language. To Bankim Chandra goes the credit of writing the first novel in Bengali 'দুর্গেশনন্দিনী' and perfecting the Bengali prose style. This is broad outline is the scenario of the awakening in Bengal – an awakening that reached its apogee in the work of Rabindra Nath Tagore. Tagore himself, in several essays including his book 'চারিত্রপূজা' has paid homage to the Humanists and his 'কলান্তর' - a book of essays charts the course of the Renassance and its achievement.

The eflorescene of a national language and literature gave birth to an awareness of nationalism - a sentiment that eventually sparked off the struggle for independence.

Rammohan & Vidyasagar called turned to the occident with a view towards invigorating and enlivening the legacy of the orient. The young Bengals, prompted by their euthusiasm for the West, renounced the East, altogether Bankim Chandra sougth to establish, through comparison the superiority of the East over the West. Rabindranath in his turn, transcended both East and the West, in persuit of a higher possibility - internationalism.

The Europeans chose to designate their cultural reurgence during the 15th & 16th centuries as the Renaissance. And we emulated them in giving our own resurgence the same name. The Renaissance in Bengal may perhaps be more aptly characterised as an awakening. A nation that slept too long and had consequently forgotten its past awoke to a world that had left it far behind. While Rammohan Roy accused his sleeping brethen, out of their torpor, Bankimchandra with his prodigious sense of history and fiery natinalism, sought to bring their past alive to fellow Bengalis, who had so long been oblivious of it.

That India had always been prone to foreign invasions and receptive to foreign influence is a truism. One wonders, however, why it took the magic ward of the British to awaken the somnolent and fossilized Bengalis, Surely it would be no exaggeration to state that the British were not just another medieval nation like the Turk or the Arabs, when they began their colonisation in India. Their predecessors the Mughals had enriched India greatly by dint of their enthusiastic patronage of literature, and, architecture and music. But the British were after all a modern nation, an enterprising and dynamic band of shrewd traders and astute politicians with an impressive intellectual tradition. Hence, a total cultural conquest followed.

The 'Sea' is as it were a 'leit motive' in the story of national resurgence. It was the closure of the sea way during the reign of the Sena's that had ushered in a prolonged phase of obscurantism and stagnation. It was the reopening of the sea, once again, that wafted to this moribund land the first adumbrations of change. The West and the East opened then doors to each other to echoe the famous line of Tagore's 'ভারততীর্থ':– "পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার সেথা হতে সবে আনে উপহার দিবে আর নিবে, মিলিবে মিলাবে যাবে না ফিরে এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।"